মানুষের জন্য

প্রফুল্ল রায়

উৎসর্গ

শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত

অগ্রজপ্রতিমেষু

মানুষের জন্য

হুগলী জেলার এই ছোট্ট শহরে কলকাতার ডাউন লোকাল ট্রেনটা মিনিটখানেক থেমেই আবার ছুট লাগাল। আর তারই মধ্যে পেছন দিকের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এলেন ফাদার হ্যারিস ম্যাকফারসন।

এ শহরের নাম রাজানগর। শহরের নামে স্টেশনের নাম।

এখন বিকেলও না, আবার সন্ধ্যেও না। দিনটা দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় থমকানো। অনেক অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সূর্যটা লাল টুকটুকে প্রকাণ্ড একটা বলের মতো সেখানে স্থির অনড় হয়ে আছে।

সময়টা অঘ্রানের শেষাশেষি; অর্থাৎ হেমন্তকাল। হিসেব অনুযায়ী বছরের এই চতুর্থ ঋতুটার আয়ু আর ক'দিনই বা; দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

নামেই হেমন্ত; নইলে শীত তার দখল নেবার জন্য এরই ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন, অঘ্রানের এই শেষ বেলায় উত্তর দিক থেকে এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দূরে, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে, গাছপালার মাথায় মিহি সিল্কের মতো হিম জমতে শুরু করেছে। রোদ অবশ্য আছে, তবে তা বিষণ্ণ এবং মলিন; দ্রুত তার তাপ জুড়িয়ে আসছে।

ডাউন লোকাল ট্রেনটা থেকে একা ফাদার হ্যারিস ম্যাকফারসনই নামেন নি; হুড়মুড় করে আরো আশী নব্বই জন যাত্রী নেমেছে। তবু সাদা সাদা মানুষের ভিড়ে অনিবার্যভাবে দৃষ্টি যাঁর ওপর গিয়ে পড়ে তিনি ফাদার হ্যারিসই।

বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু সাতচল্লিশ আটচল্লিশের বেশি দেখায় না। সাড়ে ছ ফুটের মতো হাইট। চওড়া চওড়া হাড়ের

ফ্রেমে দৃঢ় সমুন্নত শরীর তাঁর। এত বয়েসেও মেরুদণ্ড টান টান; গায়ে এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই।

ছত্রিশ বছর আগে সেই নাইনটিন থার্টি এইটে ইংল্যাণ্ডের এক চার্চ থেকে এদেশে এসেছিলেন ফাদার হ্যারিস। সেই থেকে এখানেই আছেন। ট্রপিক্যাল কান্ট্রির তীব্র ঝাঁঝালো রোদ এবং অজস্র বৃষ্টিপাতে অবশ্য গায়ের রঙটা জ্বলে গেছে। গাত্রবর্ণ এখন তাঁর পোড়া পোড়া, তামাটে। মাথার সামনের দিক থেকে প্রচুর চুল উঠে গেছে, ফলে কপালটা আজকাল মাঠের মত বড় দেখায়।

এই মুহূর্তে তাঁর পরনে আধময়লা ঢোলা সারপ্লিস; পায়ে সাদা মোজা, সাদা কেডস্। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, কাঁধে মোটা কাপড়ের ব্যাগ।

মাস তিনেক আগে সেই আশ্বিনে রাজানগর থেকে চলে যেতে হয়েছিল ফাদার হ্যারিসকে। এতদিন পর আজই আবার এখানে ফিরে এলেন।

নুড়ি-বিছানো প্লাটফর্মে আস্তে আস্তে পা ফেলে স্টেশন গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ফাদার হ্যারিস। ডাউন ট্রেনটা থেকে আর যেসব লোকজন নেমেছিল তারাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ভিড়ের ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

'অনেকদিন পর ফাদারকে দেখলাম। রাজানগর ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিল?'

'কলকাতার হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে কেন?'

'ফাদারের খুব অসুখ করেছিল যে।'

কথাটা ঠিক। তিন মাস আগে সেই আশ্বিনের শুরুতে কলকাতায় গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ফাদার হ্যারিস। কিডনিতে পাথর জমেছিল, ফলে অপারেসন করাতে হয়েছে, বেশ বড় রকমের অপারেসন। তারপরও অনেকদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল। আজই

'রিলিজ' পেয়েছেন। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে অপারেসন-জনিত ক্লান্তির ছাপ তাঁর চোখেমুখে মাখানো।

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ কাছে এগিয়ে এসে তাঁর শারীরিক ভালোমন্দ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করছিল। ফাদার হ্যারিস হাসিমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন এবং তাদের সম্পর্কেও খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর অর্থাৎ তিন যুগের ওপর এদেশে আছেন তিনি। বাঙলা ভাষাটা যে কোন বাঙালীর মতোই বলতে পারেন। উচ্চারণে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই।

একটু পর দেখা গেল, গেটে টিকিট জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন ফাদার হ্যারিস।

স্টেশনের ঠিক বাইরেই ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড এক সিমুল গাছের তলায় সাইকেল-রিক্সার ষ্ট্যাণ্ড। রিক্সাওলারা জোরে জোরে ঘন্টি বাজিয়ে সওয়ারী ডাকছিল। হঠাৎ অনেকদিন পর ফাদার হ্যারিসকে দেখে তারা যেমন খুশী তেমনি অবাকও খানিকটা। প্রায় সমস্বরেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'কবে এলেন ফাদার বাবা?'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আজই রে, এক্ষুনি—চারটে পঞ্চাশের ট্রেনে।'

'এখন কেমন আছেন?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'আপনার অসুখটা সেরে গেছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচলাম।'

একটা রিক্সাওলা, নাম তার শ্যাম, বয়েস সাতাশ-আটাশ, পাকানো বেতের মতো চেহারা, বলল, 'আপনার সঙ্গে তো সাইকেল নেই। চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সেই প্রথম যৌবনে, যখন তাঁর বয়েস চব্বিশ পঁচিশ, রাজানগরে এসেছিলেন ফাদার হ্যারিস। তখন থেকে নিজের একটা সাইকেলে করে এ শহরে এবং তার চারপাশের গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। অবশ্য

মাঝখানে যে ক'দিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন সে ক'টা দিন বাদ। সাইকেল সঙ্গে নেই, অথচ ফাদার হ্যারিস রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, এ দৃশ্য যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু হাসপাতাল থেকে আজই এখনই ফিরলেন, এই মুহূর্তে সাইকেল কোথায় পাবেন ?

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'না রে, রিক্সা লাগবে না।'

শ্যাম প্রায় ধমকেই উঠল, 'নকশাবাজি ছাড়ুন তো। তিন মাস হাসপাতালে থেকে এলেন। আবার বুঝি সেখানে ফেরার ইচ্ছে ?'

ধমকটুকু বেশ লাগল ফাদার হ্যারিসের। ছেলেটা তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে। ভালো তাঁকে অনেকেই বাসে, শ্রদ্ধা ভক্তিও করে কেউ কেউ, কিন্তু শ্যামের টানটা অন্য রকমের। সেটা যে কি, অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই ছেলেটির সঙ্গে তাঁর আলাপ সাত আট বছর আগে। বাপ মরবার পর তিন চারটে ভাইবোন আর বিধবা মাকে নিয়ে একেবারে অথৈ সমুদ্রে পড়েছিল শ্যাম। রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে সে, ওই বিদ্যেয় আর যাই হোক চাকরি-বাকরি হয় না। হাতের কাছে অবশ্য একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ হাঁ করে ছিল ; অনায়াসেই শ্যাম তার ভেতর তলিয়ে যেতে পারত। সে হয়ে উঠতে পারতো কুখ্যাত ওয়াগান ব্রেকার, কিংবা ছেনতাইয়ের দলেও নাম লেখাতে পারত। এই শহরের বহু যুবকই তো সৎভাবে বাঁচবার পথ না পেয়ে ওয়াগন ভাঙছে, ছেনতাই করছে। কিন্তু তেমন যোগ্যতা বা সাহস কোনটাই নেই শ্যামের। সুতরাং দ্বিতীয় সহজ যে রাস্তাটা খোলা ছিল তা হল মা আর ভাইবোনদের নিয়ে না-খেয়ে মরা। মরতই ওরা কিন্তু সেই সময় ফাদার হ্যারিসের সঙ্গে দেখা। তিনি একে ওকে ধরে কিছু টাকা তুলে শ্যামকে একটা সাইকেল রিক্সা কিনে দিয়েছিলেন ; সেই রিক্সাটাই ওদের বাঁচিয়েছে। সে জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই শ্যামের।

ফাদার হ্যারিস স্নিগ্ধ হাসলেন, 'আরে বাবা হেঁটে গেলে কিছু হবে না ; আমি একেবারে ভালো হয়ে গেছি।'

শ্যাম বলল, 'যা খুশি করুন। এতটা হেঁটে আবার যদি লাট খেয়ে বিছানায় পড়েন এ শ্লাকে দোষ দিতে পারবেন না।' বলেই নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল সে।

শ্যামের কথাবার্তার ধাঁচই এই রকম। চাঁছাছোলা, স্পষ্টাস্পষ্টি। কথার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ইডিময় জুড়ে দেয় সে। শুধু শ্যাম নয়, এ কালের ছেলেদেরই ভাষা-টাষাগুলো কিরকম যেন হয়ে গেছে। ফাদার হ্যারিসের কখনও চমক লাগে, কখনও বা আমোদ অনুভব করেন। যাই হোক শ্যামের গালে আলতো টোকা দিয়ে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'ভয় নেই, লাট খেয়ে পড়ব না। আচ্ছা চলি—' আসলে এখন রিক্সায় উঠতে ইচ্ছা করছিল না তাঁর।

রিক্সা স্ট্যাণ্ডের গা ঘেঁষে একটা চওড়া রাস্তা সোজা পশ্চিমে গেছে। এই রাস্তাটা যেন রাজানগরের মেরুদণ্ড। ফাদার হ্যারিস সেখানে পা বাড়ালেন, তারপর সোজা পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলেন।

রাস্তাটার দুধারে পুরনো আমলের বাড়িঘর, মন্দির। মাঝে মাঝে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা, ডোবা, পুকুর, মজা খাল। ক্বচিৎ কখনো বিদ্যুৎচমকের মতো এক-আধটা ঝকঝকে আধুনিক বাড়ি। মাথার ওপর প্রচুর পাখি উড়ছিল।

তিনমাস পর রাজানগরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ভাল লাগছিল ফাদার হ্যারিসের। হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় আদ্যিকালের বাড়িঘর এবং চারদিকের দৃশ্যাবলী খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। এই শহরটার ওপর তাঁর বড় মায়া। জীবনের দীর্ঘ ছত্রিশটা বছর এখানে কেটে গেছে। এ শহরের রাস্তাঘাট, অলিগলি, প্রতিটি ধুলোর কণা তাঁর চেনা। এখানকার এবং চারপাশের দশ-বারোটা গ্রামের সমস্ত মানুষকে তিনি চেনেন। মুখ চেনা নয়, তাদের নাম, তাদের বাপ-ঠাকুর্দার নাম, সাংসারিক অবস্থা, কার ক'টা ছেলেপুলে—সব কিছুই তাঁর জানা।

চলতে চলতে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে ফাদার হ্যারিসকে সেই প্রশ্নটাই করছে, 'কবে এলেন বাবাসাহেব ?' কিংবা 'এখন শরীর কেমন আছে ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করছিল এবং সতর্কও করে দিচ্ছিল, 'ভারী অসুখ থেকে উঠলেন বাবাসাহেব। তার ওপর শীতও পড়ে যাচ্ছে। একটু সাবধানে থাকবেন। আগের মতো অতো খাটবেন না।'

এক ধরনের তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছিল ফাদার হ্যারিসের। এত মানুষের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং উৎকণ্ঠা তাঁকে অভিভূত করে ফেলছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় শহরের মাঝমধ্যিখানে এসে পড়লেন ফাদার হ্যারিস। এই জায়গাটা রাজানগরের সব চাইতে জমজমাট অংশ। এখানে ঝকঝকে রেস্তোরাঁ আছে, লণ্ড্রী আছে, ডে এ্যাণ্ড নাইট সারভিসের ডিসপেনসারি আছে. হরেকরকম বা গোটা কয়েক স্টোরও চোখে পড়ে। আর আছে জুতোর দোকান, রেডিওর দোকান, জমকালো পান-সিগারেট সফ্‌ট্ ড্রিংকের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেই সঙ্গে মুখোমুখি দুটো সিনেমা হল—'রামধনু' আর 'অলঙ্কার' টকীজ।

এই মুহূর্তে দুটো হলেই শো ভেঙেছে। নতুন শো আরম্ভ হবার আগে দু-জায়গাতেই বেশ সমারোহ করে চটকদার হিন্দী ফিল্মের গান বাজানো হচ্ছে।

রামধনু টকীজের ফোর্থ ক্লাস টিকিট কাউণ্টারটার সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এ্যাসবেস্টসের শেড। সেখানে ক'টি ছোকরা, বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস, পরনে ড্রেনপাইপ, পায়ে সস্তা হাওয়াই চপ্পল, গালে চওড়া জুলপি, চোয়াড়ে মুখ, স্বাস্থ্যহীন শরীর—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। ঘুমোবার জন্য কয়েক ঘণ্টা বাদ দিলে সারাদিনই ওদের এই সিনেমা হলের কাছে দেখা যায়।

ফাদার হ্যারিসকে দেখামাত্র ছোকরাগুলো দৌড়ে এসে তাঁর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। মোট পাঁচ জন। ওদের সবাইকেই চেনেন ফাদার; এই শহরেরই ছেলে। নামও জানেন—হাবলে, বিশে, বল্টু, গৌর আর নেত্য। ওদের কেউ জুট মিলের লেজার-কীপারের ছেলে, কেউ কাপড়-দোকানের কর্মচারীর, কারো বাপ মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, কারো বাপ সরকারী অফিসের কেরানী। অর্থাৎ লোয়ার মিডল ক্লাস নামে যে শ্রেণীটা এখনও কোনরকমে আগাছার মতো টিকে আছে ওরা সেখান থেকে এসেছে।

বল্টু বলল, 'এই যে ফাদার, এ্যাদ্দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে?'

ফাদার হ্যারিসের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধটা বন্ধুত্বের। শুধু ওদের সঙ্গেই না, এ শহরের যত মানুষ—শিশু-যুবক-প্রৌঢ়—সবার সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার সমবয়সী বন্ধুর মতো। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কেন, তোরা জানিস না?'

'শুনেছিলাম তোমার খুব অসুখ করেছে। কী হয়েছিল?'

ফাদার হ্যারিস সারপ্লিস তুলে দেখালেন। তলপেটে দশ বারো ইঞ্চির মতো গভীর কাটা দাগ। বললেন, 'পাথর জমেছিল, অপারেসন করে বার করতে হল।'

বিশে গলার ভেতরে গোঙানির মতো একটা শব্দ করে বলল, 'ড্রপ সিন ফেল মাইরি, ড্রপ সিন ফেল। মাথা শ্লা ঘুরে যাচ্ছে।'

হাসতে হাসতে সারপ্লিসটা নামিয়ে দিলেন ফাদার হ্যারিস।

নেত্য বলল, 'অতখানি চিরেছে; পেটে কত বড় পাথর গজিয়েছিল? শিবলিঙ্গের মতো?'

বোকাটে মুখ করে হাবলে বলল, 'না রে, আস্ত একখানা হিমালয় পর্বত।'

ফাদার হ্যারিস হাসতে লাগলেন, 'যা বলেছিস!'

বল্টু বলল, 'বাঁচবার জন্য তা হলে টেরিফিক একখানা ফাইট দিয়েছ, তাই না ?'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ফাইট না দিলে কি বেঁচে থাকা যায় রে ?' বলতে বলতেই হঠাৎ লক্ষ করলেন, হাতের আড়ালে ওরা সিগারেটগুলো লুকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ তাঁর সম্মানার্থে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সিগারেটটা আর খাচ্ছে না। আচমকা বিশের হাত ধরে উঁচুতে তুলে চোখ কুঁচকে রগড়ের গলায় ফাদার হ্যারিস বললেন, 'লুকিয়ে রেখেছিস কেন ? খা না—'

বিশে হকচকিয়ে গেল, 'ধুস মাইরি, এমন গাড্ডায় ফেলে দেবার মানে হয় ?'

বল্টু বলল, 'তুমি হলে ফাদার লোক, আমাদের গুরুজন। তোমার সামনে সিগারেট ফুঁকতে পারব না।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলে আমার গুরুত্ব পাংচার হয়ে যাবে না।' এক এক সময় মজা করবার জন্য ওদের দু-একটা ইডিয়ম তিনিও লাগিয়ে দেন।

যাই হোক বলা সত্ত্বেও সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল না ওরা।

ফাদার হ্যারিস এবার বললেন, 'আমার কথা তো হল ; এবার তোদের খবর বল্।'

বল্টু বলল, 'আমাদের কোন খবর নেই। যেমন দেখে গিয়েছিলে তা-ই চলছে। রাস্তার ধারে দিনরাত ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আর বাবা যখন থাকে না স্যুট করে ইঁদুরের মতো বাড়ি ঢুকে খেয়ে আসি। তবে বাবার ধর্মশালা বন্ধ হল বলে।'

নেত্য বলল, 'আমার বাবা তো নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে।' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ফাদার হ্যারিসের হাতে দিল সে। তাতে লেখা আছে, 'তোমার মতো চব্বিশ বছরের দামড়া মোষকে আমি আর খাওয়াইতে পারিব না। তিনদিনের নোটিশ দিলাম, ইহার মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লও।'

লেখাটা পড়ে বিমূঢ়ের মতো ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

নেত্য বলল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হয় না। তাই এটা লিখে সুতো দিয়ে দরজার গায়ে লটকে রেখে গিয়েছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর গভীর গলায় ফাদার হ্যারিস বললেন, 'চাকরি টাকরির কিছু চেষ্টা করছিস ?'

শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে চোখ দুটো গোল্লা পাকাল বিশে। বলল, 'চাকরি, সে আবার কী!' এ রকম একটা বিস্ময়কর কথা আগে সে শুনেছে বলে মনে হল না।

আর বল্টু করল কি, আচমকা কাতুকুতু লাগার মতো খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল। হাতদুটো ওপরে তুলে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে বলতে লাগল, 'ফাদার চাকরির কথা বলছে রে! উরি ব্বাস, চাকরি—' এমন রগড়ের কথা সে যেন এই প্রথম শুনল।

গৌর বলল, 'ভুগে ভুগে তোমার না মাইরি বারোটা বেজে গেছে। সব জেনে শুনে কেন যে নক্সাবাজি করছ! আজকাল চাকরি কখনও পাওয়া যায়!'

বিষাদে মনটা ভরে যেতে লাগল ফাদার হ্যারিসের। থেমে থেমে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে।'

নেত্য বলল, 'ঠিক বলেছ। আমরা একটা প্ল্যানও করেছি।'

'কিসের প্ল্যান রে ? ছেনতাই-ফেনতাই শুরু করবি নাকি ?'

'ধুস—'

'তবে কি ওয়াগন ভাঙবি ?'

'আরে না।'

'তা হলে ?'

'এখন বলছি না। একটু ওয়েট করো, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে, ওয়েট করব। আচ্ছা এখন যাই রে—' পা বাড়াতে

গিয়ে থেমে গেলেন ফাদার হ্যারিস। এতক্ষণ খেয়াল করেন নি, এবার ওদের পাঁচজনকে ভালো করে লক্ষ করলেন। তারপর বললেন, 'ফাইভ মাস্কেটীয়ার্সকে দেখছি। বাকি দু'জন কোথায়? ভানু আর লেলো?' এতদিন শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস ওদের সাতজনকে একসঙ্গে দেখা যেত।

বল্টু বলল, 'সি ইউ টি—কাট। ভানু ওয়াগন ব্রেকারদের দলে ঢুকেছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এখন জেলে। আর লেলো অবিনাশের সঙ্গে ভিড়েছে। মাকড়ার এখন টেরিফিক রেলা।'

'কোন অবিনাশ?'

'অবিনাশ চাটুজ্যে। তোমার ফেভারিট স্টুডেন্ট ছিল এক সময়—এখন রাজানগরের সব চাইতে বড় বিজনেসম্যান। মনে পড়ছে?'

অবিনাশের কথায় মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ফাদার হ্যারিসের। তিনি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। শুধু বললেন, 'আর দাঁড়াব না রে, চলি।' বলেই আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন।

পেছন থেকে হাবলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এখন আর কোথাও ডুব মেরো না। তুমি না থাকলে রাজানগর একেবারে ফিউজ হয়ে যায়—বিলকুল আন্ধেরা।'

মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকালেন ফাদার হ্যারিস। হেসে হেসে হাত নাড়তে লাগলেন। দেখলেন ওরাও হাত নাড়তে নাড়তে আবার টিকেট কাউন্টারের সামনে সেই এ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় ফিরে যাচ্ছে! এরাই কি লস্ট জেনারেসন? বিদ্যুৎ চমকের মতো ভাবনাটা মাথায় একবার ধাক্কা দিয়ে গেল। না-না, মানুষ সম্পর্কে আশা বা বিশ্বাস হারাতে নেই। সামনের দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন ফাদার হ্যারিস।

এখন শেষ হেমন্তের সন্ধ্যা নেমে আসছে ঘন হয়ে। একটু আগেও মরা সোনার মতো ম্যাড়মেড়ে অনুজ্জ্বল রোদ এখানে-ওখানে লেগে ছিল,

কিন্তু এখন আর নেই। সূর্যটা কখন দিগন্তের ওপারে নেমে গেছে, কে জানে। উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোটি কোটি হিমের কুঁড়ি মিশে যাচ্ছে। কুয়াশা আর ধোঁয়া একাকার হয়ে কলকাতা থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে হুগলী ডিস্ট্রিক্টের এই ছোট্ট শহরটার গায়ে যেন একখানা কালচে জামদানি শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে পঁচিশ পাওয়ারের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। তাতে অন্ধকার দূর হয়নি। আসলে ওগুলো রাস্তাকে আলোকিত করার জন্য নয়। নেহাতই নিয়ম রক্ষার জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে আগের মতোই আরো অনেক লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। সেই একই রকম কুশল প্রশ্ন করছিল তারা; ফাদার হ্যারিস সেই একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এক সময় শহরের জমকালো অংশটা পেরিয়ে অনেকখানি নির্জন একটা জায়গায় এসে পড়লেন ফাদার হ্যারিস। এখানে বাড়িঘর কম, যা-ও আছে ছাড়া-ছাড়া, দূরে দূরে। মানুষজনও চোখে পড়ছে না।

দূরমনস্কের মতো হেঁটে যাচ্ছিলেন ফাদার হ্যারিস। হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে উঠলেন। দেখলেন ডান ধারের একটা গলি থেকে একটা কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, তার পেছন পেছন দু-তিনটে ছোকরা। স্পষ্টই বোঝা যায় ছোকরা-গুলো মেয়েটাকে তাড়া করেছে। মেয়েটার মুখ থেকে ভীত গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

ফাদার হ্যারিস থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটা ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এসে থেমে গেল। ওদিকে তাঁকে দেখে সেই ছোকরাগুলোও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ফাদার হ্যারিস উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, 'কে তুমি?' বলেই রাস্তায় অস্পষ্ট আলোয় চিনতে পারলেন, 'শিবানী না?'

মেয়েটার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। তার চোখে পৃথিবীর সব ভয়

আর আতঙ্ক জমা হয়ে আছে যেন। খুব জোরে জোরে বারকতক শ্বাস টানল সে। তারপর অস্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ—'

'কী হয়েছে? অমন ছুটছিলি কেন?'

দূরে গলিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে শিবানী বলল, 'ওরা—'

গলির ভেতর ছোকরাগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো-টালো ছিল না; তাই ওদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ওরা কারা?'

'লেলো আছে। আর দু'জনকে চিনি না।'

লেলো! দশ মিনিটও হয় নি তার সম্বন্ধে বল্টুদের কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন ফাদার হ্যারিস। তাকে যে এ রকম একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেখবেন, কে ভাবতে পেরেছিল!

লেলো খুবই খারাপ ছোকরা। এতকাল সিনেমা-হলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে গাঁজার কলকের মতো সিগারেট বাগিয়ে ফুঁকতে দেখেছেন ফাদার হ্যারিস, মেয়ে দেখলে মুখে আঙুল পুরে সিটি দিতে শুনেছেন। তাই বলে এ শহরেরই একটা মেয়েকে ওরকম জন্তুর মতো তাড়া করবে, এ ছিল অকল্পনীয়। বিমূঢ়ের মতো এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর গলির দিকে যেতে যেতে বললেন, 'এই লেলো শোন—'

লেলো কিন্তু এগিয়ে এল না, তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপুরুষের মতো ওদের পালিয়ে যাওয়াটা কয়েক পলক লক্ষ করলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর শিবানীর কাছে ফিরে আসতেই সে কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি না এসে পড়লে কী যে হত!'

যা ঘটতে পারত সেই সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে গিয়ে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন ফাদার হ্যারিস। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

শিবানী আবার বলল, 'আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবেন বাবা-সাহেব ?'

ওদের বাড়িটা চেনেন ফাদার হ্যারিস ; রামধনু টকীজের বেশ খানিকটা পেছনে একটা গলির ভেতর ওরা থাকে। তার মানে আবার অনেকটা রাস্তা পিছিয়ে যেতে হবে। তা কি আর করা যাবে! এ অবস্থায় তো মেয়েটাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'চল—'

শিবানীদের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি আবার বললেন, 'কী হয়েছিল ? ওরা এ রকম তাড়া করেছিল কেন ?'

'বাবার বন্ধু হরকাকাকে তো চেনেন ; আমি এ পাড়ায় এসেছিলাম তার কাছে ক'টা টাকা ধার করতে। হরকাকাকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম ; লেলোরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে পেছনে লেগেছে।'

'তুই এসেছিলি কেন ? তোর বাবা আসতে পারল না ?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল শিবানী। তারপর ভারী গলায় বলল, 'বাবা নেই।'

ফাদার হ্যারিস অল্প ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নেই মানে ?'

শিবানী বলল, 'মারা গেছে।'

ফাদার হ্যারিস চমকে উঠলেন, 'মারা গেছে! কবে ?'

'দু'মাস হল।'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' বলতে বলতে কি মনে পড়ে গেল ফাদার হ্যারিসের, 'জানব কি করে ? তিন মাস তো আমি রাজা-নগরেই নেই।'

শিবানীর বাবা নকুল সাধুখাঁকে ভালো করেই চিনতেন ফাদার হ্যারিস। নকুল এখানকার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে এ-উকিল সে-উকিল ধরে মাঝেমধ্যে বাড়িঘর এবং জমিজমার দলিল কপি করার কাজ যোগাড় করত। তবে বেশির ভাগ সময়ই দেখা যেত

সাবডিভিসনাল পোস্ট অফিসের সামনে একটা টুল পেতে বসে আছে ; দশটা করে পয়সা নিয়ে চারপাশের কলকারখানার লেবারদের মনি-অর্ডার ফর্ম লিখে দিত সে। মোটামুটি এ-ই ছিল তার রুজি রোজগার। সাংসারিক দায়দায়িত্ব তেমন একটা ছিল না। দুটো মাত্র মেয়ে—শিবানী আর উমা, বউ অনেক আগেই মারা গিয়েছিল ; তবু কষ্টেই দিন কাটত নকুলের। তা হলে কী হয়, তার মুখে কোন দিন দুঃখকষ্টের ছাপ পড়ত না। সব সময়ই হাসিমুখ। রাস্তাঘাটে দেখাটেখা হলে ফাদার হ্যারিস যখন তার খোঁজখবর নিতেন সে বলত, 'ফাইন আছি ফাদার, আমার জন্যে ভাববেন না।' কোন কোনদিন দেখা যেত দুই মেয়েকে নিয়ে নকুল বেশ সেজেগুজে কলকাতায় চলেছে সার্কাস দেখতে কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে। আবার কখনও বা দেখা যেত প্রকাণ্ড একটা ইলিশ মাছ ঝুলিয়ে বাড়ি চলেছে। জিজ্ঞেস করলে বলত, 'আজ ইনকামটা একটু বেশি হয়ে গেছে ; দুম করে বাজারে গিয়ে মাছটা কিনে ফেললাম। আসলে ব্যাপার কি জানেন ফাদার, এই জিভটা—' আধহাত লম্বা জিভ বার করে সে বলত, 'এ শালাকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছি না। তবে—' ফাদার হ্যারিস বলতেন, 'তবে কী ?' নকুল বলত, 'বাড়ি গিয়ে হয়ত দেখব চাল নেই, তেল নেই, মশলা নেই। সব আবার ধার করে আনতে হবে।' আসলে জলের ওপর হাঁসের মতো এই পৃথিবীতে সে ভেসে বেড়াত, দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই তার গায়ে দাগ কাটতে পারত না।

ফাদার হ্যারিস আবার বললেন, কী হয়েছিল নকুলের, হঠাৎ মারা গেল ? মরার বয়স তো তার হয় নি ; আমার চাইতে কত ছোট।'

শিবানীর চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ভাঙা গলায় সে বলল, 'খুব জ্বর হয়েছিল, সাতদিন একটানা ভুগল। তারপরই—'

ফাদার হ্যারিস আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

একটু চুপচাপ।

তারপর শিবানীই হঠাৎ শুরু করল, 'বাবা মরে যাবার পর থেকে লেলোটা জ্বালিয়ে মারছে। যখন তখন বাড়ি এসে দরজায় কড়া নাড়ে; ওর জন্যে রাস্তায় বেরুতে পারি না। অথচ দেখুন, বাবা নেই; নানা দরকারে বাইরে বেরুতে হয়। কী যে করব!'

ফাদার হ্যারিস বললেন, ভয় নেই: আমি তো আছি। লেলোকে ডেকে বলে দেব'খন যেন গোলমাল না করে।' একটু থেমে কি ভেবে আবার বললেন, 'লেলোটা ছেলেবেলা থেকেই পাজী কিন্তু এ রকম হারামজাদা তো ছিল না এত সাহস ওর হল কোত্থেকে?'

শিবানী বলল, 'কিছুদিন হল ও নাকি অবিনাশ চাটুজ্যের সঙ্গে জুটেছে। তারপর থেকেই—'

একটু আগে বল্টুদের কাছে লেলো আর অবিনাশের কথা শুনেছেন ফাদার হ্যারিস। তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। দূরমনস্কের মতো বললেন, 'তারপর থেকেই বুঝি পাখা গজিয়েছে!'

শিবানী উত্তর দিল না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ফাদার হ্যারিস এবার বললেন, 'বাবা নেই, তোদের চলছে কি করে? নকুল কিছু টাকা-পয়সা রেখে গেছে?'

ঘাড় নিচু করে আস্তে মাথা নাড়ল শিবানী, 'না।'

'তা হলে?'

'দু একটা গয়না ছিল, তাই বিক্রি করে দেড় মাস চালিয়েছি। এখন ধার-টার—' কথা শেষ না করেই থেমে গেল শিবানী।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'তাই তো রে ভীষণ ভাবনায় ফেলে দিলি। ধারের ওপর ক'দিন আর চলে! ইমপসিবল্।'

শিবানী নতমুখে হাঁটতে লাগল, কিছু বলল না।

ফাদার হ্যারিস আবার বললেন, 'আচ্ছা দেখি তোর জন্যে কী করতে পারি—'

এক সময় রামধনু টকীজের পেছন দিকে নানা গলি ঘুরে ওরা

শিবানীদের নোনাধরা পুরনো ভাঙাচোরা একতলা বাড়িটার সামনে এসে পড়ল। শিবানী কড়া নাড়তেই ওর ছোট বোন উমা এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। তার হাতে একটা নিভু নিভু হেরিকেন। খুব সম্ভব ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে ওদের বাড়ির কানেকসান কেটে দিয়ে গেছে।

উমার বয়স ষোল সতের। পরনে আধময়লা ছাপা শাড়ি আর হলুদ রঙের জামা। উমা আর শিবানী, ছুই বোনেরই চেহারা এক। পানপাতার মতো মুখ, ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ, গায়ের রঙ আশ্বিনের রোদের মতো। পাতলা ফুরফুরে নাক, সরু চিবুক, সরু কোমর, লম্বা টান দেওয়া হাত পা, আঙুল ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাস্থ্যও ভাল। নকুলের রোজগার যা-ই হোক, মেয়েদের সে যত্নেই মানুষ করেছে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'যা, ভেতরে যা।'

শিবানী বলল, 'আপনি আসবেন না?'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'না রে, আজ আর যাব না। এখন চলি, শিগগিরই একদিন আসব।' পেছন ফিরে পা বাড়াতে গিয়েই কি ভেবে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'তা হ্যাঁ রে, তোরা ছু'জন ছাড়া বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ না। বাবার মারা যাবার খবর পেয়ে এক মাসি এসেছিল। দিনকয়েক ছিল কিন্তু তারও তো ছেলেমেয়ে ঘরসংসার আছে। সে সব ছেড়ে ক'দিন আর আমাদের কাছে থাকতে পারে!'

'তা তো ঠিকই—' ফাদার হ্যারিসকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। ছু'টি সুশ্রী যুবতী মেয়ের পক্ষে, যাদের দেখাশোনা বা রক্ষা করার জন্য মাথার ওপর কেউ নেই, এ রকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে অভিভাবকহীন একা একা থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় ছুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তিনি বললেন, 'খুব সাবধানে থাকিস। রাত্রিবেলা ঘর থেকে একেবারে বেরুবি না।'

শিবানী মাথা নাড়ল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'দোর বন্ধ করে দে, আমি এবার যাব—'

শিবানী হঠাৎ খুব আস্তে করে ডাকল, 'বাবাসাহেব—'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কিছু বলবি?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

এক পলক শিবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফাদার হ্যারিস; তারপর তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'কিসের ভয়? কেউ না থাক, আমি এখনও বেঁচে আছি। কোন চিন্তা নেই।'

তাঁর কথাটা যেন গভীরভাবেই বিশ্বাস করল শিবানী। তার চোখ মুখ দেখে মনে হল দুর্ভাবনা থেকে সে অনেকখানি মুক্ত।

ফাদার হ্যারিস আর দাঁড়ালেন না; শিবানীদের ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

দুই

রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা শহরের মাঝখান দিয়ে মেরুদণ্ডের মতো সোজা পশ্চিমে চলে গেছে সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌঁছুনো যায় সেটা হল ক্যাথলিকদের একটা মিশন। মিশনের কম্পাউণ্ডটা বিশাল ; তার ভেতর চার্চ আছে, স্কুল আছে। খেলার মাঠ, হোস্টেল—সব কিছুই চোখে পড়ে। স্কুল, চার্চ এবং হোস্টেলটা পাশাপাশি। তারপর প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। মাঠ পেরুলে অত্যন্ত নিরিবিলি দু-ঘরের একতলা ছোট্ট একটা বাড়ি। ফাদার হ্যারিস ওখানেই থাকেন।

এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত আরো অনেক ফাদার আছেন। তাঁরা থাকেন স্কুল এবং চার্চ সংলগ্ন হোস্টেলে। তার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য ফাদারদের পছন্দ করেন না ফাদার হ্যারিস। আসলে ছত্রিশ বছর আগে যখন তিনি এখানে আসেন তখন ওই নির্জন চুপচাপ বাড়িটা তাঁর খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল। সে সময় এখানকার মিশনের চার্জে যিনি ছিলেন তাঁর অনুমতি নিয়ে ফাদার হ্যারিস ওই বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে যান।

যাই হোক ফাদার হ্যারিস যখন তাঁর একতলা বাড়িটায় পৌঁছলেন, শেষ হেমন্তের রাত আরো গাঢ় হয়েছে। কখন যেন দিগন্তের তলা থেকে চাঁদটা উঠে এসেছিল। কুয়াশার সঙ্গে চাঁদের আলো মিশে এখন সব কিছু ঝাপসা।

দরজা খোলাই ছিল। ফাদার হ্যারিস ঘরে ঢুকে দেখলেন দুর্গা চাল বাছছে। আর পিলে একধারে তক্তাপোষের ওপর নাক পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে সমানে বকবক করে যাচ্ছে। যার উদ্দেশ্যে পিলের এই বকবকানি অর্থাৎ দুর্গা কিন্তু কিছুই বলছে না; এমন কি

হুঁ-হাঁ শব্দ পর্যন্ত করছে না। তার মুখ দেখে মনে হয় না, কানে কিছু ঢুকেছে। সেটা অকারণে নয়, দুর্গা বোবা এবং কালা।

ফাদার হ্যারিসকে দেখে পিলে লাফ দিয়ে তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাদার এসেছে, ফাদার এসেছে!' পিলের বয়েস নয়-দশ, রোগা চেহারা। সে প্রায় নাচানাচিই শুরু করে দিল।

ওদিকে দুর্গাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। সে-ও উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা অবশ্য পিলের মতো নাচতে পারছিল না ; তবে তার বোবা চোখ, আয়নার ওপর রোদ এসে পড়লে যেমন হয় তেমনি চকচক করছিল।

এই মিশন, চার্চ, স্কুল, হোস্টেল কিংবা অন্য ফাদাররা—এ সব তো আছেই। কিন্তু একান্তভাবে এই দু'জন—পিলে আর দুর্গা এদের নিয়েই ফাদার হ্যারিসের সংসার। অথচ এরা তাঁর কেউ না।

দুর্গার বয়স তিরিশ-বত্রিশ। গোল মতো মুখে, পিঠ-ছাপানো ঘন চুলে, বড় বড় সরল চোখে, শরীরের শক্ত বাঁধুনিতে এক ধরনের আলগা শ্রী আছে।

দুর্গার আসল নাম কী, কোথায় তার বাড়ি, কিংবা বাপ-মা-ভাই অথবা স্বামী-কেউ তার আছে কিনা, কিছুই জানেন না ফাদার হ্যারিস। কেননা তাকে জিজ্ঞেস করে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাবার উপায় নেই। দুর্গা নামকরণটা তিনিই করেছিলেন।

বছর তিনেক আগে হঠাৎ একদিন ফাদার হ্যারিসের চোখে পড়েছিল, স্টেশনের গায়ে রিক্সা স্ট্যাণ্ডটার উল্টোদিকে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ভিক্ষে করছে দুর্গা। গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতো করুণ একটানা শব্দ করে সে পয়সা চাইছিল। আগে আর তাকে রাজানগরে ছাখেননি ফাদার হ্যারিস। একটু অবাক হয়েই কিছুক্ষণ লক্ষ করেছিলেন। তারপর পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে নাম ধাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু দুর্গা উত্তর ছায় নি। তার ভাষাহীন গলা থেকে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল শুধু।

ওধার থেকে রিক্সাওলারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মেয়েমানুষটা বোবা ফাদার।'

ফাদার হ্যারিস বলেছিলেন, 'একে তো আগে দেখিনি, কোত্থেকে এসেছে জানিস?'

'না। আজই সকাল থেকে এখেনে বসে ভিক্ষে করছে।'

সেই যে ফাদার হ্যারিস তাকে দেখেছিলেন তারপর তিনটে দিনও কাটেনি। হঠাৎ এক দুপুরবেলায় কে যেন এসে খবর দিয়েছিল, স্টেশনের কাছে তার ভিক্ষের জায়গাটায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দুর্গা। শুনেই ছুটে গিয়েছিলেন ফাদার হ্যারিস এবং যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে তাতে হাত পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। দুর্গার সারা শরীর রক্তাক্ত; জামা কাপড় ফালা ফালা ছেঁড়া। গাল, গলা এবং বুক থেকে ডেলা ডেলা মাংস কারা যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। তাকে দেখতে দেখতে মনুষ্যজাতি সম্বন্ধেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন ফাদার হ্যারিস। দ্রুত একটা রিক্সায় তুলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে পৌঁছে আরো যা জানা গিয়েছিল তা ভয়াবহ। অজ্ঞান হবার আগে বোবা মেয়েটাকে কম করে আট দশ জন ধর্ষণ করেছে।

হাসপাতালে সুস্থ হয়ে উঠতে মাস দুয়েকের মতো সময় লেগেছিল দুর্গার। এর মধ্যে রোজ একবার করে তাকে দেখতে গেছেন ফাদার হ্যারিস।

হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেবার পর দুর্গাকে কোথাও যেতে দ্যাননি ফাদার হ্যারিস, এই শ্বাপদসঙ্কুল পৃথিবীতে বোবা অসহায় মেয়েটার জীবন এক মুহূর্তও নিরাপদ নয়। সোজা তাকে নিজের কাছেই নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই আছে সে। এই ভাষাহীন মূক মেয়েটা কিছুই প্রকাশ করতে পারে না তবু ফাদার হ্যারিসের দিকে তাকিয়ে তার নিষ্পাপ সরল চোখে যা চকচকিয়ে ওঠে তার নাম বোধ হয় কৃতজ্ঞতা।

মেয়েটা দারুণ কাজের। একটা মিনিটও হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সারাদিন যেন দশ হাতে কাজ করে যাচ্ছে সে, দশ হাতে ফাদার হ্যারিসের সেবা করছে। সেই কারণেই হয়তো তিনি ওর নাম দিয়েছেন দুর্গা। মাঝে মাঝে রগড়ের গলায় বলেন, 'দশভুজা' কিংবা 'মা দুগগো—'

পিলের চেহারার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। বছরখানেক আগে রাজানগর শ্মশানের কাছে যে ডোমপাড়াটা আছে সেখান থেকে ওকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন ফাদার হ্যারিস। কারণ দু'দিন আগে-পরে কলেরায় ওর মা-বাপ মরে গিয়েছিল এবং ওকে দেখবার আর কেউ ছিল না।

পিলের আসল নাম পিলে না, গোবিন্দ-টোবিন্দ কিছু একটা হবে। কিন্তু তার পেট জোড়া ঢাউস একটা পিলে রয়েছে এবং সেটা বোতল বোতল ওষুধ খাইয়েও কিছুতেই সারানো যাচ্ছে না। সে জন্য মজা করে ফাদার হ্যারিস তাকে 'পিলে' বলে ডাকেন, কখনও বা বলেন 'পিলে সাহেব'। এই নামেই আপাতত রাজানগরে সে বিখ্যাত।

ফাদার হ্যারিস এক পলক দুর্গাকে দেখলেন, তারপর পিলেকে স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'ভাল আছিস তো তোরা ?'

পিলে বলল, 'হ্যাঁ।'

দুর্গা তাঁর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। তাঁর গলা থেকে আধফোটা স্বর বেরিয়ে এল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আমিও খুব ভাল আছি, বুঝলি ? অসুখ একদম সেরে গেছে—' বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। এটা তাঁর নিজস্ব ঘর; আগের ঘরখানা পিলে আর দুর্গার।

দুটো ঘরই সমান মাপের এবং আকারে বেশ বড়। পুরনো আমলের মতো খড়খড়ি লাগানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছ'টা করে জানালা

প্রতিটি ঘরে, তা ছাড়া দুটো করে দরজা তো আছেই। দুই ঘরের মধ্যবর্তী দেয়ালে বাড়তি আরেকটা দরজা আছে। ফাদার হ্যারিস সেই দরজাটা দিয়েই নিজের ঘরে এসেছেন।

দুর্গা আর পিলেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। পিলে তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

দ্রুত এক পলক ঘরটা দেখে নিলেন ফাদার হ্যারিস। একধারে জানালা ঘেঁষে তক্তাপোষ পাতা, তার ওপর ধবধবে নিভাঁজ বিছানা, মাথার কাছে ছোট্ট টেবল, সেখানে পেপার ওয়েট, দোয়াত, কলম, টেবল ল্যাম্প, লিখবার জন্য সাদা কাগজের প্যাড, পিন কুশন, ক্লিপের বাক্স পারিপাটি করে সাজানো। আর যা আছে তা হল কিছু ইংরেজি ও বাঙলা সাময়িক পত্র। ফাদার হ্যারিস বিভিন্ন বাঙলা ইংরেজি মাসিক এবং সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ বা ডায়েরী জাতীয় লেখা লিখে থাকেন। ওই সব কাগজপত্র 'কমপ্লিমেণ্টারি কপি' হিসেব নিয়মিত তাঁর নামে আসে।

ফাদার হ্যারিস দেখলেন, পত্রপত্রিকাগুলোর প্যাকেট খোলা হয় নি। অর্থাৎ যে তিন মাস তিনি রাজানগরে অনুপস্থিত সেই সময় ওগুলো এসেছে।

বিছানাটা যেখানে তার উল্টোদিকের দেয়ালে তিনটে বড় বড় কাচের আলমারি; সেগুলো বইয়ে ঠাসা। নানা রকমের বই— রবীন্দ্ররচনাবলী, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-ডি. এল. রায়-দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমের যাবতীয় গ্রন্থ, অতুলপ্রসাদের গীতিগুঞ্জ, রামকৃষ্ণ কথামৃত, এ ছাড়া দেশ বিদেশের নানা ক্লাসিক, দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থও চোখে পড়ে। আলমারিগুলোর মাথাতেও অগুনতি বই স্তূপাকার হয়ে আছে। আরেক দিকের দেওয়ালে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ প্রকাণ্ড একটা অয়েল পেন্টিং। ফাদারের এক ছাত্র ছবিটা এঁকে তাঁকে উপহার দিয়েছিল।

গোটা ঘরখানা ঝকঝক করছে। মেঝেতে এক দানা ধুলোবালি

বা কাগজের কুচিটুচি পড়ে নেই। ফাদার হ্যারিস জানেন, দুর্গাই এভাবে ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তকতকে করে রেখেছে। কোন কিছুই ওর জন্য অগোছালো বা অপরিষ্কার থাকার উপায় নেই।

চারদিকে তাকিয়ে তৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে তার ভেতর থেকে সন্দেশ, বিস্কুট আর ডালমুটের প্যাকেট বার করলেন। দুটো সন্দেশ আর এক মুঠো ডালমুট পিলের হাতে দিয়ে প্যাকেটগুলো দুর্গাকে দিতে দিতে বললেন, 'এই যে মা দশভুজা, এগুলো রাখো তো। সব দশ হাতে বিলিয়ে দিও না আবার, নিজের মুখেও একটু আধটু দিও।' দুর্গার স্বভাব হল, ভালো খাবার-দাবার নিজে না খেয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়ানো, এতেই তার আনন্দ। দুর্গাকে জানেন বলেই ফাদার ওই কথাটা বললেন।

তাঁর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে হয়তো কথাটা বুঝল দুর্গা। মুখ নামিয়ে সে হাসল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'বড্ড খিদে পেয়েছে জননী, তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও।' দুর্গা চলে যাবার পর পিলেকে বললেন, 'পিলপিলি সাহেব, আগে হাত-পা ধুয়ে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করব।'

ডালমুট চিবুতে চিবুতে পিলে ঘাড় কাত করল।

বাড়ির ঠিক বাইরে উত্তর দিক ঘেঁষে বাঁধানো কুয়োতলা, তার গায়ে টালির চালের বাথরুম। সেখান থেকে হাত-মুখ ধুয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন ফাদার হ্যারিস। ময়লা সারপ্লিস আর ঢলঢলে ফুল প্যান্ট ছেড়ে ধবধবে খদ্দরের পাজামা আর ঢোলা ফতুয়া পরে নিলেন। বাইরে উত্তুরে হাওয়ার গায়ে আরো হিম মিশেছে। বেশ শীত শীত লাগছিল। সুতরাং ফতুয়ার ওপর একটা চাদরও জড়িয়ে নিলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর পা তুলে বিছানার ওপর

আরাম করে বসলেন। পিলেও গুটিসুটি মেরে তাঁর গা ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল।

মাথার দিকে যে টেবলটায় কাগজপত্র কালি কলম সাজানো রয়েছে সেটা হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনলেন ফাদার হ্যারিস. দেখলেন কলকাতা থেকে গত তিন মাসে শুধু পত্র-পত্রিকাই আসেনি ; খানকয়েক চিঠিও এসেছে বেশির ভাগই খামের চিঠি, দু-একটা পোস্ট কার্ড।

ফাদার হ্যারিস খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করতে করতে পিলেকে বললেন, 'আর দু মিনিট, চিঠিগুলো একটু দেখে নিই, কেমন ?'

পিলে বলল, 'আচ্ছা।'

মোট দশখানা চিঠি এসেছে সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের কাছ থেকে ; সবগুলোতেই তাঁর লেখার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে। চিঠি পেয়েই যেন তিনি লেখা পাঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। বাকিগুলো তাঁর লেখার গুণগ্রাহীদের। নানা সাময়িকপত্রের ঠিকানায় ওগুলো এসেছিল, সেখান থেকে রি-ডাইরেক্ট করে ওরা এই মিশনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মুগ্ধ পাঠকদের চিঠি পেতে ফাদার হ্যারিসের ভাল লাগে। এই বয়সেও রীতিমত উত্তেজনা অনুভব করেন এবং নতুন করে অজস্র লিখতে ইচ্ছা করে। যাই হোক চিঠিগুলো দু-তিনবার করে পড়ে ফাদার হ্যারিস আপনমনে নিজেকে বললেন, 'তোমার তো বেশ ফ্যান আছে হে—' তারপরে ভাবলেন, তিনমাস একটা অক্ষরও লেখেন নি. কাল থেকেই তাঁকে লিখতে বসতে হবে।

চিঠিগুলোর ওপর পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে এবার ফাদার হ্যারিস পিলের দিকে ফিরলেন, 'তারপর পিলপিলি সাহেব, এই তিন মাস বেশ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ছিলি তো ?'

তৎক্ষণাৎ মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে দিল পিলে। গলার সুরে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'হুঁ-উ-উ-উ—'

'তোর পিলেটা কেমন আছে রে ?' বলেই চাদরের ভেতর থেকে

হাত বার করে পিলের পেটটা টিপে দেখতে দেখতে ভয়ের গলায় বললেন, 'একটুও তো কমে নি। যে ওষুধগুলো দিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো খেয়েছিলি ?'

'বড্ড তেতো—' মুখটা ভীষণ করুণ করে পিলে বলল।

'তার মানে খাসনি—' ফাদার হ্যারিস চোখ দুটো গোল এবং স্থির করে পিলের দিকে তাকালেন। আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোর পিলে জন্মেও সারবে না ; ওটায় চড়েই তুই স্বর্গে যাবি। স্বর্গারোহণ তোর কেউ আটকাতে পারবে না।'

পিলে কী বুঝল সে-ই জানে ; হি-হি করে হাসতে লাগল।

'খুব তো হাসি হচ্ছে—' পিলের গালে আলতো একটা টোকা দিয়ে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এবার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করি। এই তিন মাস রোজ স্কুলে গেছিস ?' ডোমপাড়া থেকে নিজের কাছে এনে খানিকটা সুস্থ-টুস্থ করে পিলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ফাদার হ্যারিস।

পিলে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'তুমি ছিলে না ; আমার মন খারাপ হয় না বুঝি ?'

'তার মানে স্কুলে রোজ যাস নি। পড়ার কথা যেই উঠল অমনি আমার জন্যে তোমার মন খারাপ! তুই একটা যাচ্ছেতাই রকমের বাঁদর হয়ে উঠেছিস পিলে। দাঁড়াও, কাল থেকে তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই মাঝখানের মাঠটা পেরিয়ে ওধারের হোস্টেল আর চার্চ থেকে কয়েকজন ফাদার এবং ছাত্র এসে পড়ল। ফাদার হ্যারিসের আসার খবর ওরা পেয়ে গেছে।

ফাদারদের একজনের নাম হার্বার্ট, একজনের হ্যালিডে, বাদ-বাকিদের ডগলাস, ফারমোর, এণ্ড্রুজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা সবাই তাঁর সহকর্মী এবং দীর্ঘকাল একসঙ্গে এই রাজানগরে আছেন।

প্রাথমিক কুশলপ্রশ্নের পর ফাদার ফারমোর বললেন, 'আপনি যে আসবেন, কই আগে বলেননি তো।'

ফাদারদের মধ্যে কেউ না কেউ রোজই একবার করে হাসপাতালে তাঁর কাছে গেছেন। কিন্তু আজই যে তাঁকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে, এ খবরটা আগে ভাগে কারোকে জানাননি ফাদার হ্যারিস।

ফাদার হ্যারিস হেসে হেসে বললেন, 'আপনাদের সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

'তা অবশ্য দিয়েছেন—প্লেজান্ট সারপ্রাইজ।' অন্য ফাদাররাও হাসলেন। তারপর রাজানগরে নামবার পর রাস্তায় আর সবাই ফাদার হ্যারিসকে যা বলেছে ওঁরাও আরেকবার তাই বললেন। অর্থাৎ এবার থেকে আর স্ট্রেন করা চলবে না, এখন বেশ কিছুদিন শুধু বিশ্রাম।

খানিকক্ষণ গল্প টল্প করে ফাদার এবং ছাত্ররা চলে গেল। আর তখনই দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার ওপর এসে দাঁড়াল দুর্গা। হাতের ইশারায় ফাদার হ্যারিস এবং পিলেকে ডাকল।

ফাদার হ্যারিস বিছানা থেকে নামতে নামতে পিলেকে বললেন, 'চল হে পিলপিলি সাহেব, রান্না বোধহয় হয়ে গেছে।'

পাশের ঘরে যেতেই দেখা গেল, মেঝেতে চটের ওপর সুতোর নানারকম কাজ-করা দু'খানা আসন পাতা রয়েছে। সে দুটোর সামনে ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত, দু তিন রকমের ভাজা এবং থালা ঘিরে চার পাঁচটা করে কাঁসার বাটি, জলের গেলাস। আসনগুলো দুর্গাই নিজের হাতে সেলাই করেছে। আগে ফাদার হ্যারিস চীনেমাটির প্লেটে খেতেন। দুর্গা এসে এইসব কাঁসার থালা গেলাস তাঁকে দিয়ে কিনিয়েছে।

খেতে খেতে ফাদার হ্যারিস বলতে লাগলেন, 'তোর হাতের রান্না একেবারে অমৃত, বুঝলি মা দশভুজা। তিন মাস হাসপাতালের রান্না খেয়ে খেয়ে পেটে একেবারে চড়া পড়ে গেছে। ওহ্, বড়ির

ঝোলটা যা করেছিস না! আর লাউপাতা দিয়ে মটর ডালটা—একেবারে হেভেন!'

পাশ থেকে পিলে হঠাৎ ডাকল, 'বাবাসাহেব—'

'কী?'

'তুমি আসতে এত সব রান্না হল। নইলে দুর্গাদি ডাল আর ডালের বড়া, তা নইলে আলুভাজা ছাড়া আর কিচ্ছু রাঁধত না। আমার একদম খেতে ইচ্ছে করত না।'

ফাদার হ্যারিস দুর্গার দিকে তাকালেন।

দুর্গা গলার ভেতর আধফোটা শব্দ করে হয়তো বোঝাতে চাইল, ফাদার না থাকলে ঘটা করে এত ঝাল-ঝোল পোলাও-কালিয়া রান্নার মানে হয় না।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'বোকা, তুই একেবারে বোকা—'

খাওয়া দাওয়ার পর ফাদার হ্যারিস তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। দুর্গাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, তাড়াতাড়ি বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে মশারি খাটিয়ে হাতের ইশারায় তাঁকে শুয়ে পড়তে বলল। যতক্ষণ না ফাদার হ্যারিস মশারির ভেতর ঢুকলেন দুর্গা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল; তারপর পাশের ঘরে চলে গেল।

খুবই ক্লান্তি লাগছিল তবু শোওয়ামাত্র ঘুম এল না। টেবল ল্যাম্প জ্বেলে সেই ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্টাতে লাগলেন ফাদার হ্যারিস। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বই-টই না পড়লে ঘুমই আসে না; এটা তাঁর অনেক কালের পুরনো অভ্যাস।

পত্র-পত্রিকাগুলো দেখতে দেখতে আচমকা সেই মেয়েটা অর্থাৎ শিবানীর মুখ মনে পড়ে গেল ফাদার হ্যারিসের। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাটা এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। অন্যমনস্কের মতো ম্যাগাজিনগুলো আবার টেবলে রেখে তিনি ডানদিকে ফিরলেন। ডাইনে শিয়রের দিকের জানালার পাল্লা আধাআধি খোলা, সেখান

দিয়ে হুড়হুড় করে শীতের বাতাস ঘরে ঢুকছিল। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস ওই পাল্লাটা খোলাই থাকে, নইলে ঘুমোতে পারেন না ফাদার হ্যারিস। প্রেসারের সামান্য গোলমাল আছে, সব দরজা জানালা বন্ধ থাকলে তাঁর শ্বাস আটকে আসে।

আধ-খোলা জানালা দিয়ে বাইরের মাঠ দেখা যায়, তবে গাঢ় হিমে এখন তা ঝাপসা। হাজার হাজার জোনাকি অন্ধকার বিঁধে বিঁধে জ্বলছিল আর নিভছিল। আকাশ জুড়ে এত কুয়াশা যে তারা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

শীতের মাঠ, ঘন কুয়াশা, ঝাপসা আকাশ কিংবা অগুনতি জোনাকির জ্বলা আর নেভা কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলেন না ফাদার হ্যারিস। ঘুরে ফিরে শিবানীর মুখটাই তাঁর চোখের সামনে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ খুট করে শব্দ হল; পরক্ষণে সমস্ত ঘরখানা অন্ধকারে ডুবে গেল। ফাদার হ্যারিস জানেন, দুর্গা এসে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল। হাসপাতালে যাবার আগে থেকেই দুর্গা তাঁকে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে দিচ্ছে না। রাত বাড়লেই পাশের ঘর থেকে উঠে এসে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে যায়।

বোকা মেয়ে! অন্ধকারে হাত-পা-মুখ-মাথা এবং চোখের সামনের সব দৃশ্যপট মুড়ে দিলেই কি ঘুম আসে? সেই মেয়েটা—শিবানী, তাঁকে ক্রমশ অস্থির করে তুলল। না, যেভাবেই হোক, ওকে বাঁচাতে হবে।

তিন

খুব ভোরে ওঠা ফাদার হ্যারিসের চিরকালের অভ্যাস। নেহাত অসুখ-বিসুখ না হলে বিছানায় শুয়ে কোনদিনই তিনি সূর্যোদয় দ্যাখেন নি। রোজ ঘুম থেকে উঠেই তিনি বেড়াতে বেরিয়ে যান। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে দিগন্তের তলা থেকে সূর্য উঠে আসছে। আজ ঘুম ভাঙবার পর ফাদার হ্যারিস দেখলেন, এখনও ভালো করে সকাল হয়নি : পুব দিকের আকাশে আবছামতো একটু আলোর ছোপ ধরেছে। সারা রাত যে হিম পড়েছিল সেগুলো শিশিরের কণা হয়ে গাছের পাতায়, ঘাসে, বাড়িঘরের মাথায় জমে আছে।

ফাদার হ্যারিস কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে দেখলেন দুর্গা এরই মধ্যে উঠে পড়েছে। এখন ঝারিতে করে বাড়ির সামনের ছোট বাগানটায় ঘুরে ঘুরে ফুল গাছে জল দিচ্ছে। সবই দিশী ফুল—গাঁদা, সন্ধ্যামালতী, দোপাটি, ফাঁকে ফাঁকে দু একটা গন্ধরাজ ; এককোণে পঞ্চমুখী জবা আর কাঁঠালা চাঁপার একটা গাছও রয়েছে। এখানে আসার পর নিজের হাতে এই বাগানটা করেছে দুর্গা। এর যত্ন টত্ন সে-ই করে থাকে। পিলেকে দেখা গেল না ; এত সকালে সে কোনদিনই ওঠে না।

মুখটুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে জামাটামা বদলে নিলেন ফাদার হ্যারিস ; গায়ে সারপ্লিস চড়িয়ে বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর পুরনো র‍্যালে সাইকেলখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাগানের কাছ দিয়ে যাবার সময় দুর্গার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ইঙ্গিতে সে তাঁকে চা খেয়ে যেতে বলল। ফাদার হ্যারিস হাত নেড়ে বললেন, 'এখন না রে, ফিরে এসে খাব।' বলেই সাইকেলে উঠে মিশন-কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বাইরের বড় রাস্তায় চলে এলেন।

মিশনটা যেখানে সেটা রাজানগরের পশ্চিম প্রান্ত। তারপর থেকেই ধানের খেত, ফাঁকে ফাঁকে ঢ্যাঙা চেহারার তাল-সুপুরি, খাল-বিল-গ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য বড় রাস্তাটা ধরে উত্তর দিকে গেলে দেখা যাবে এই শহর আরো অনেকদূর পর্যন্ত নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে ফাদার হ্যারিস ভোরে উঠে কোনদিন ধানখেতের দিকে চলে যেতেন, কোনদিন যেতেন উত্তরে, কোনদিন বা শহরের মাঝখানে। আজ কোনদিকে যাবেন একটু ভাবলেন। তারপর কি মনে করে উত্তরেই চললেন।

শিরদাঁড়ার মতো সেই বড় রাস্তাটা রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে এক ছুটে সোজা মিশন পর্যন্ত এসেছে, তারপর মিশনের গা ছুঁয়ে পিঠ বাঁকিয়ে চলে গেছে উত্তরে।

মিশন কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে একটুখানি গেলেই রাস্তার উল্টোদিকে টুকটুকিদের লালরঙের একতলা বাড়ি। এ বাড়িতে এখনও কারো ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হয় না; দরজা-জানালা সব বন্ধ। ফাদার হ্যারিস যে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন, এ খবর নিশ্চয়ই টুকটুকি পায় নি। পেলে সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত। ভোরবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে না বেরুলে রক্ষে নেই। ফাদার হ্যারিস ভাবলেন, ফেরার পথে একবার টুকটুকিদের বাড়ি যাবেন।

খানিকটা যাবার পর আকাশ ফরসা হয়ে আসতে লাগল। হিম হিম আড়ষ্ট ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল। এখন দু-চারটে পাখিও চোখে পড়ছে; ভোরের আলো দেখে তারা গাছপালার মাথা থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

পাখিদের তবু দেখা যাচ্ছে কিন্তু রাস্তা একেবারে ফাঁকা, মানুষজন নেই। এ শহর বড় ঘুমকাতুরে; শীতের ভোরে তার ঘুম ভাঙতে চায় না।

শহরের এদিকটা ছাড়া-ছাড়া, অসংলগ্ন। বাড়িগুলো গা

ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে নেই ; মাঝখানে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা।

উত্তর দিকে শহরের সীমানা যেখানে শেষ, বড় রাস্তাটা তারপরও খানিকটা এগিয়ে গেছে এবং যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে সেখানে টালির চালের ঘিঞ্জি বস্তি। এটা রাজানগরের মেয়েপাড়া। তারপর আছে প্রকাণ্ড একটা ঝিল, ঝিলের ওপারে আঁশফল, বাবলা এবং নানা বুনো গাছপালার জঙ্গল ; জঙ্গল পেরুলে ধানের খেত।

শহর ছাড়িয়ে ফাদার হ্যারিস যখন মেয়েপাড়ার কাছাকাছি এলেন তখন দেখতে পেলেন কালীকিশোর কুণ্ডু একটা সাইকেল-রিক্সা করে উল্টোদিক থেকে আসছে। তার বয়েস পঞ্চান্ন ছাপান্ন, থলথলে শরীর। পেটে পুরু চর্বির থাক, শুধু কি পেটে, গালে-গলায়-ঘাড়ে সর্বাঙ্গে সর্বত্র তার চর্বি। লোকটা যেন সারা গায়ে চর্বির গন্ধমাদন বয়ে বেড়াচ্ছে। রঙ টকটকে ফর্সা, কিন্তু চোখের তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালচে শ্যাওলার মতো স্থায়ী দাগ। মাথার চুলে কলপ, গলায় সোনার হার। লোকটার প্রচুর পয়সা। কণ্ট্রাক্টারি করে দশ হাতে কামায়।

এই মুহূর্তে রিক্সার একদিকে কাত হয়ে বসে ছিল কালীকিশোর, পা দুটো রিক্সা থেকে প্রায় বেরিয়ে আছে। পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা ; ধুতিতে মদ আর মাংসের ঝোলের দাগ।

ফাদার হ্যারিস জানেন, সারারাত মেয়েপাড়ায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরছে কালীকিশোর। ওখানে বাঁধা মেয়েমানুষ আছে তার, এই রিক্সাওলাটাও বাঁধা, রোজ ভোরে এসে তাকে এখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

রিক্সাটা ফাদার হ্যারিসের কাছে আসতেই কালীকিশোর জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই রোখ, রোখকে—'

রিক্সা থেমে গিয়েছিল। এমন জায়গায় রাস্তা আটকে সেটা দাঁড়িয়েছে যে ফাদার হ্যারিসকে সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হল।

কালীকিশোর ঢুলুঢুলু চোখে ফাদার হ্যারিসকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'ফাদার হরিশ—হরিশ্চন্দ্র না?'

ফাদার হ্যারিসকে কেউ বলে 'ফাদার', কেউ 'ফাদার সাহেব', কেউ 'বাবা', কেউ 'বাবা সাহেব', কেউ বা 'ফাদার হরিশ' কিংবা 'ফাদার হরিশ্চন্দ্র'। হ্যারিস নামটাকে দিশী মতে শোধন করে হরিশ কি হরিশ্চন্দ্র করে নিয়েছে। যে যে নামেই ডাকুক, ফাদার হ্যারিসের আপত্তি নেই। সব ডাকেই সাড়া দেন। মাঝে-মধ্যে রগড়ের গলায় বলেন, 'কৃষ্ণের মতো আমার অষ্টোত্তর শত নাম রে—'

যাই হোক কালীকিশোরের কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ফাদার হরিশ্চন্দ্রই—'

'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছিল। হাসপাতালে ছিলাম।'

জড়িত স্বরে কালীকিশোর বলল, 'শুনেছি সকালবেলা গ্রেট ম্যান—মানেটা কি যেন—' একটু থেমে ভেবে নিয়ে প্রায় হাওয়া থেকে মানেটা বার করে আনল সে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে, মহাপুরুষ। মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হল। প্রাতঃপেন্নাম ফাদার।' বলেই দু হাত কপালে ঠেকাতে গিয়ে আচমকা কি মনে পড়ে গেল তার, 'উঁহু-উঁহু এভাবে নয়, পায়ের ধুলো নিতে হবে।'

রিক্সার হাতলে ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনেটুনে উঠে দাঁড়াল কালী-কিশোর, তারপর সত্যিসত্যিই যখন সে নেমে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ফাদার হ্যারিস তাড়াতাড়ি দু হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'না-না, পায়ের ধুলো নিতে হবে না।'

'নিতে হবে না!' কালীকিশোর শরীরটাকে তক্ষুনি আলগা করে ছেড়ে দিল। দেখা গেল সে আবার আগের মতো সীটের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে। ঈষৎ আক্ষেপের সুরে বলল, 'নিলে কিন্তু ভাল হত ফাদার। আফটার অল আপনি গ্রেট—দারুণ গ্রেট—'

ভোরবেলা এই মাতাল লম্পট হতচ্ছাড়া টাইপের লোকটাকে

একেবারেই ভাল লাগছে না। শহরের এদিকে এ সময়টায় এলে কালীকিশোরের সঙ্গে দেখা হতে পারে, ফাদার হ্যারিসের খেয়াল ছিল না। মনে পড়লে এধারে নিশ্চয়ই আসতেন না। যাই হোক বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'থাক থাক। তুমি কেমন আছ, বল—'

'খুব ভাল আছি ফাদার ; আমি শালা কোন সময় খারাপ থাকি না। খারাপ থাকার কথা কোনদিন বলেছি ?'

ফাদার হ্যারিসকে স্বীকার করতেই হল, বলে নি।

কালীকিশোর নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আমি—এই আমি—কালীকিশোর কুণ্ডু রসেবশে থাকি সবসময়, বারোমাস—'

লোকটার মুখ থেকে থুতু আর বাসি মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। ফাদার হ্যারিস নাকটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, 'জানি তো। আচ্ছা এখন যাই, পরে দেখা হবে—'

'কেন, যাবেন কেন ? কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল ?' হঠাৎ কালীকিশোরের গলার স্বর চড়ল।

ফাদার হ্যারিস সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেকদিন, তিন চার মাস। কেন ?'

'এতদিন পর দেখা : দু-একটা সুখদুঃখের কথা না বলেই চলে যাবেন ? ইউ হেট মি—ইয়েস হেট—'

'কি আশ্চর্য, ঘেন্না করব কেন ? কারোকেই আমি ঘেন্না করি না।'

'তা হলে এ্যাভয়েড করতে চাইছেন। সব শালাই আমাকে এ্যাভয়েড করে। কিন্তু আপনি তো জানেন আমি একটা সাচ্চা লোক —অনেস্ট ম্যান।'

'জানি তো।'

কালীকিশোর উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল, 'আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা রোড কন্ট্রাক্টর হতে পারি, ঘুষ দিয়ে, মাল খাইয়ে, মেয়েছেলে সাপ্লাই করে টেণ্ডার পাশ করাই, ট্র্যাশ মাল দিয়ে রাস্তা বানাই তবু বলছি আমি অনেস্ট—টু হাণ্ড্রেড পারসেন্ট অনেস্ট হোয়াই অনেস্ট ?

আমার রিপ্লাই হল, যা করি কিছুই লুকিয়ে চুরিয়ে না। বাঙলা খেয়ে সবার সামনে আমি নদ্দমায় গড়াগড়ি দিই। মেয়েছেলের বাড়ি ঢুকি সবার নাকের ডগা দিয়ে। যা করি তা বলি। নো হাইডিং বিজনেস; নো লুকোচুরি, নো ঢাক ঢাক গুড় গুড়—' বলতে বলতে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল কালীকিশোর, 'এই রাজানগরেই তো কত শালা ধম্মপুত্তুর রয়েছে। যুধিষ্ঠিরের বাচ্চারা—ওই যে সিনেমাহলের মালিক বিজলী সাহা, ইনকামট্যাক্সের সারদা উকিল, রেলের তারাপদ হোড়; আরো কত নাম বলব? সব শালার সামনে ঘোমটা, তলায় খ্যামটা। ভদ্দরলোক সব! আমি শালা বাঘের বাচ্চা, অনেস্ট—সাচ্চা আদমী। যা করব বুক ফুলিয়ে করব।' উত্তেজনায় বেলুনটা ফুলে উঠেছিল। আচমকা হাওয়া বেরিয়ে চুপসে যাবার মতো দেখালো কালীকিশোরকে। ঝপ করে আবার রিক্সার ওপর কাত হয়ে পড়ল সে। খানিকটা পর যেন হুঁশ ফিরে এল তার; কার সঙ্গে কথা বলছে সে সম্বন্ধে হুঁশ। তাড়াতাড়ি জিব কেটে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ফাদার; আমার মুখটা শালা পচা নর্দমা—ড্রেন! হাঁ করলেই গন্ধ বেরোয়—'

ফাদার হ্যারিস কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

কালীকিশোর বলতে লাগল, 'যাক গে, অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি; আর না; এবার যাই। একদিন আপনার কাছে যাব ফাদার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবে।'

কালীকিশোর রিক্সাওলাকে বলল, 'চালা রে মদনা—'

ফাদার হ্যারিস সাইকেলটা সরিয়ে রাস্তা করে দিলেন; কালী-কিশোরের রিক্সা চলতে লাগল। খানিকটা যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে কালীকিশোর বলল, 'পায়ের ধুলোটা নিতে দিলেন না ফাদার; একটু পুণ্যি হত। মনটা বড্ড খুঁত খুঁত করছে। গ্রেট ম্যান আপনি, গ্রেট—'

ফাদার হ্যারিস একটু হাসলেন ; জবাব না দিয়েই তাঁর সাইকেলে উঠলেন ; তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। কালীকিশোরটা দু-কান কাটা, ওর চামড়ায় লজ্জা-সঙ্কোচ বলে কিছু নেই।

আরো খানিকটা যাবার পর দেখা গেল, মেয়েপাড়া থেকে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে জহর মোক্তার, শুঁড়িখানার ভেণ্ডার মতি সাহা, এক্সাইজের নাড়ু ভটচায—এমনি দু-চারজন বেরিয়ে আসছে। কাল রাত্তিরে নিশ্চয়ই ওই সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল ; এখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে আরশোলার মত গুটি গুটি বেরিয়ে পড়েছে। ফাদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওরা থমকে দাঁড়াল, তারপর এক ঝটকায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আর যাই হোক কালীকিশোরের মতো বুকের পাটা ওদের নেই ; ওরা ছিঁচকে টাইপের হারামজাদা।

আরেকটু যাবার পর ফাদার হ্যারিস যে তিনজনকে দেখতে পেলেন —রজত, নির্মল আর অতীন—তাদের এ পাড়ায় কোনদিন দেখা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। স্তম্ভিত ফাদার সাইকেল থেকে নিজের অজান্তেই নেমে পড়লেন।

ওরা তিনজনই তাঁর ছাত্র। মিশন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে পড়তে গিয়েছিল। ফাদার হ্যারিস জানেন, রজত আর নির্মল বি-কম পাস করেছে কিন্তু অতীনের বাবা দুম করে মরে যেতে ওর লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় নি ; বি-এস-সি ফার্স্ট ইয়ারেই ও ব্যাপারটার ইতি করে দিতে হয়েছিল।

তিনজন লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে। একটা চাকরি-বাকরি না হলে ওদের আর চলছিল না। হন্যে হয়ে ওরা কাজ খুঁজছিলও ; বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের চারধারে যে বিশাল অফিসপাড়া সেখানে দরজায় দরজায় নিয়মিত হানা দিয়েছে, ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটগুলো পকেটে পকেটে ঘুরে ঘামে ভিজে ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে গেছে, ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত লাইন দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড

কতবার যে রিনিউ করেছে ওরা তার হিসেব নেই। কিন্তু কোথায় চাকরি? গত কয়েক বছর পশ্চিম বাঙলার ওপর দিয়ে যা গেছে চাকরির কোন আশাই ছিল না। কলকারখানার দরজা ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, কত অফিস যে এখান থেকে উঠে দিল্লি, বোম্বাই হরিয়ানা আর রাজস্থানে চলে যাচ্ছিল তার ঠিকঠিকানা নেই। এদিকে বছর বছর কলেজ থেকে, স্কুল থেকে, ইউনিভার্সিটি, আর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলো থেকে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক বেরিয়ে এসে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলছিল। এই রকম একটা দম-আটকানো অবস্থায় তিন চারটে বছর কাটাবার পর ওরা একদিন স্থির করে ফেলেছিল, আর চাকরি-বাকরির পেছনে ছোটা নয়। ওর পেছনে ছুটে তিন চারটে বছর ফালতু নষ্ট হয়ে গেছে। এবার অন্য রাস্তা। হাসপাতালে যাবার বেশ কিছুদিন আগেই ফাদার হ্যারিস খবর পেয়েছিলেন, ওরা ওয়াগন ব্রেকার হয়ে উঠেছে; শুধু তাই নয়, ফাঁকে স্মাগলিংও চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ব্যাপারে নাকি অবিনাশের সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে। ওয়াগন ভাঙা কিংবা স্মাগল-করা মাল ওরা অবিনাশের কাছে বেচে দেয়। অবিনাশ কি ভাবে সেগুলোর গতি করে, সে-ই বলতে পারে। রাজানগরের সবাই বলে অবিনাশ নাকি বাঘের খেলা জানে।

অবিনাশের কথায় আচমকা কেলোর মুখটা মনে পড়ে গেল ফাদার হ্যারিসের, তার সঙ্গে শিবানীর। কিন্তু অবিনাশ, কেলো বা শিবানী—এই মুহূর্তে ভাবনার ওপর আবছা মতো ছায়া ফেলেই মিলিয়ে গেল। ওই তিনটে ছেলে—নির্মল, অতীন এবং রজত—তাঁর তিন ছাত্র, মেয়ে-পাড়ার সদর দরজার কাছে ওদের দেখতে দেখতে ফাদার হ্যারিসের মনে হতে লাগল কেউ যেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং উত্তপ্ত কিছু তাঁর স্নায়ুতে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য আজকাল কত কী-ই না করছে! চাকরি-বাকরির যা বাজার। সে সম্বন্ধে ভাবতে গেলে

তাঁর দুঃখ হয় কিন্তু উপায়ই বা কী? তাই বলে মেয়েপাড়ার এই নরকে আসতে হবে!

নির্মল, অতীন, রঞ্জত—তিনজনেই ফাদার হ্যারিসকে দেখতে পেয়েছিল। কয়েক পলক বাজ-পড়া মানুষের মতো তারা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর রাস্তা থেকে বাঁ দিকের মাঠে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

যতক্ষণ ওদের দেখা গেল, তাকিয়ে থাকলেন ফাদার হ্যারিস। ওরা এতদূর নেমে গেছে, কে ভাবতে পেরেছিল। হঠাৎ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ পর অন্যমনস্কের মতো আবার সাইকেলে উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন।

ঝিলের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, পুবদিকটা আরো ফর্সা হয়ে গেছে। গাছপালার মাথা এবং ঘাসের ডগা থেকে পোখরাজের মতো শিশিরের দানাগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আরো অসংখ্য পাখি এর মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। রোদ উঠতে আর দেরি নেই।

ঝিলটা প্রায় আধ মাইলের মতো লম্বা। ভোরবেলা এদিকে এলে সাইকেলটা কোন গাছের গায়ে কাত করে রেখে তিনি হাঁটতে থাকেন। ঘণ্টাখানেকের মতো হাঁটাহাঁটি করে সাইকেলে উঠে আবার মিশনে ফিরে আসেন।

আজও একটা ঝাঁকড়ামতো আঁশফলের গাছে সাইকেলটা হেলিয়ে রেখে ফাদার হ্যারিস হাঁটতে লাগলেন।

ঝোপঝাড়ে এই সাত সকালেই ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। একটানা বিলাপের মতো সেই ঝিল্লিস্বর চারপাশের নির্জনতাকে বিষণ্ণ করে তুলছে। মাঝে মাঝে এক আধটা বুনো খরগোশ জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুট করে বেরিয়ে আসছে; বেদানার দানার মতো লাল টকটকে চোখের মণি তাদের; সন্দিগ্ধভাবে কয়েক পলক ফাদার হ্যারিসকে লক্ষ্য করে আবার একছুটে তারা জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দু-চারটে মেঠো ইঁদুরকেও ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। আর দেখা গেল সাদা

ধবধবে অগুনতি বকের ঝাঁক। নানা দিক থেকে উড়ে উড়ে তারা ঝিলপারে আসছে এবং জলের ভেতর পা ডুবিয়ে চুপচাপ মাছের আশায় দাঁড়িয়ে থাকছে। ওদের দেখে মনে হয় ঝিলের জল ঘেঁষে থোকা থোকা কাশফুল ফুটে রয়েছে।

খরগোশ, মেঠো ইঁদুর, ঝিঁঝিঁর ডাক কিংবা বকের ঝাঁক অথবা শিশিরে ভেজা চারদিকের গাছ-লতা-পাতা, কিছুই লক্ষ্য করছিলেন না ফাদার হ্যারিস। ওই তিনটি ছেলে—রজত, নির্মল, অতীন—ঘুরে ফিরে তাঁর স্নায়ুতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি; অসুস্থ ভাবটা বাড়ছিলই; ঘাড়ের কাছটা চিন চিন করছে। ব্লাড প্রেসারটা বোধহয় আবার একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। ওরা ওয়াগন ভাঙত, স্মাগল করত, এখন মেয়েপাড়ায় রাত কাটাচ্ছে। তার মানে একটা ভাইস কি আরেকটা ভাইসকে টেনে আনে? একটা পাপক্রিয়া আরেকটা পাপক্রিয়াকে উস্কে দেয়? নাঃ, ওদের জন্য কিছুই করা যাবে না। মনে মনে ফাদার হ্যারিস গভীর হতাশার সুরে উচ্চারণ করলেন, 'দে আর লস্ট, টোটাল লস্ট।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোদ উঠে গেল। গাছের পাতা অল্প অল্প বাতাসে ঝালরের মতো দুলছে।

হাঁটতে হাঁটতে ঝিলের শেষ মাথায় চলে গিয়েছিলেন ফাদার হ্যারিস। একবার আকাশের দিকে তাকালেন তিনি; তারপর সারপ্লিসের ভেতর থেকে পুরনো আমলের সুতো-বাঁধা গোল একটা পকেট-ঘড়ি বার করে দেখলেন, সাড়ে সাতটার মতো বাজে। এবার ফিরতে হবে। পেছন ফিরে তিনি বড় বড় পা ফেলে সেই সাইকেলটার দিকে চললেন।

একটু পর দেখা গেল সাইকেলে করে ফাদার হ্যারিস ঝিলের পার থেকে বড় রাস্তায় এসে পড়েছেন। বেশিদূর যেতে হল না, তার আগেই তাঁকে নেমে পড়তে হল। ওধার থেকে মেয়েপাড়ার ক'টি মেয়ে

আসছিল, তাদের কাঁধে পরিষ্কার শাড়ি-জামা আর গামছা। ঝিলে চান করতে চলেছে ওরা।

মেয়েদের সামনের দিকে যে রয়েছে সে শোভা। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মোটা ভারী চেহারা, গোল মুখে বসন্তের দাগ, চুলে পাক ধরেছে, খাটো ঘাড়, চোখ দুটো বেশ বড় বড়। গায়ের রঙ মাজা। সে মেয়েপাড়াটা চালায় ; ওখানকার কর্ত্রীই বলা যেতে পারে তাকে। তার পেছনে কম বয়সের পাঁচটা মেয়ে : তাদের তিনজনকে চেনেন ফাদার—জবা, লীলা আর মিলনবালা। বাকি দু'জন অচেনা ; এদের আগে আর কখনও ছাখেননি।

ফাদারকে দেখেই শোভা ছুটে এল। তাঁকে না ছুঁয়ে পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাল আছেন বাবাসাহেব ?'

ফাদার হ্যারিস আগেও লক্ষ্য করেছেন শোভা কখনও তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে না : পা থেকে একটু দূরে মাথা ঠেকায়। শুধু সে-ই না, অন্য মেয়েরাও ওভাবেই প্রণাম করে। ওদের মনোভাবটা বুঝতে পারেন ফাদার হ্যারিস। শোভাদের ধারণা, যেখানে তাদের বাস, যেরকম নোংরা কুৎসিত জীবনযাত্রা, তাতে ফাদারের মতো পবিত্র মানুষকে ছোঁবার অধিকার নেই।

ফাদার হ্যারিস সস্নেহে হেসে বললেন, 'ভাল আছি। তোরা কেমন আছিস ?'

'আমাদের আবার থাকাথাকি। নরকের পোকা হয়ে বেঁচে আছি, তার বেশি কিছু না। শুনেছিলাম, আপনার খুব অসুখ করেছিল, কলকাতার হাসপাতালে ছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল হাসপাতালে গিয়ে আপনাকে একবার দেখে আসি।'

'গেলি না কেন ?'

'সাহস হয় নি বাবাসাহেব। জানেনই তো আমি কী? ওখানে গেলে কেউ যদি শুধোত আমি কে? তখন?'

'কেউ কিছু জিজ্ঞেস করত না। করলে বলতিস আমি বাবাসাহেবের মেয়ে।'

শোভা একপলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'সেবার আমাদের অসুখের সময় আপনি কী করেছিলেন, যদ্দিন বেঁচে রইব ভুলব না। আর আপনার অসুখের সময় একদিন চোখের দেখাটা দেখতে গেলুম না, এমন পাপের জন্ম আমার—'

কুড়ি পঁচিশ বছর আগে মেয়েপাড়ায় একবার ভয়াবহ রকমের কলেরা লেগেছিল। দু একজন ছাড়া গোটা এলাকার সবাই বিছানা নিয়েছে, তিরিশ চল্লিশবার করে একজনের ভেদবমি চলছে সেই সময় মিশনের ফাদাররা ওখানে ছুটে গিয়েছিলেন। ফাদাররা সবাই, বিশেষ করে ফাদার হ্যারিস দিনরাত সেবা করে মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সে কথা কখনও ভোলে না শোভা; সে জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তার তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে ওরা, বিশেষতঃ শোভা।

সেই কলেরার পরও শোভাদের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগটা ছিল। তখন কম বয়স, মনে দারুণ উৎসাহ। প্রকৃত মিশনারীর জীবন যে জন্য উৎসর্গীকৃত অর্থাৎ মানুষের কল্যাণে মানুষের হিতার্থে কিছু করবার জন্য টগবগ করে ফুটছিলেন ফাদার হ্যারিস। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে মেয়েপাড়ার মেয়েগুলোকে আলোতে নিয়ে আসবেন ওপাড়ার কাছাকাছি একটা ওপেন এয়ার স্কুল খুলেছিলেন তিনি; আরো দু'জন ফাদারকে নিয়ে রোজ দুপুরে পড়াতে যেতেন। উদ্দেশ্য ছিল, লেখাপড়া শিখে ওরা যদি এই নোংরা গ্লানিকর জীবন থেকে বেরুতে পারে। যদি সম্মানজনক কোন কাজকর্ম জোটাতে পারে হয়তো ধীরে ধীরে সামাজিক স্বীকৃতিও পাবে। কিন্তু স্কুলটা বেশিদিন চলে নি। প্রথমত মেয়েদের দিক

থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মানুষের যৌন প্রবৃত্তি রক্তমাংসের তলা থেকে শুধু রাত্তিরের দিকেই মাথা চাড়া দেয় না, দিনের বেলাতেও সেটা সমান সক্রিয়, একই রকম গনগনে। ফাদার হ্যারিস নিজের চোখে দেখেছেন, দিনের বেলাতেই নানা কাজকর্মের ফাঁকে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মতো সময় করে নিয়ে অনেকেই হাজির হত মেয়েপাড়ায় ; তারপর মালতী কি পাখি, কোন একজনকে তুলে নিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে দিত। ফাদার হ্যারিস বুঝতে পারছিলেন, স্কুল চালিয়ে লাভ নেই, এতে ওদের প্রফেসানেরও অসুবিধা হচ্ছে ; কেননা দিনের খদ্দেরদের অনেকেই তাঁকে দেখে আর মেয়েপাড়ায় ঢুকত না। ফলে স্কুলটা উঠেই গেল। তারপর অবশ্য ওপাড়ায় আর যাননি ফাদার হ্যারিস ; তবে রাস্তাঘাটে মেয়েদের সঙ্গে দেখা-টেখা হয় ; ওরা প্রণাম করে, তাঁর খোঁজখবর নেয়, তিনিও তাদের খোঁজখবর নেন, এই ভাবেই চলে আসছে।

শোভার সঙ্গী সেই মেয়েগুলো ইতিমধ্যে কাছে এগিয়ে এসেছিল। শোভার মতো তারাও প্রণাম করে দাঁড়িয়েছে। ফাদার হ্যারিস তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাল আছিস তো জবা ? হ্যাঁ রে লীলা তুই ? তুই মিলনবালা ?'

ওরা তিনজনই ঘাড় হেলিয়ে জানাল, 'ভাল আছি বাবাসাহেব—'

এবার ফাদার হ্যারিস বাকি দুটি মেয়েকে দেখিয়ে শোভাকে বলল, 'এদের তো চিনতে পারলাম না—'

শোভা বলল, 'ওর নাম পুষ্প আর ও হল লতা। নতুন এসেছে—'

'দেশ কোথায় ?'

শোভা বলল, 'চব্বিশ পরগণা জেলায়, বসিরহাটের কাছে।'

একটু থেমে কি ভেবে আবার বলল, 'কি করবে। এখনই, এই ধানচালের মরসুমে দু টাকা আড়াই টাকা চালের কিলো। এই নরকে না এসে গতি কী ?'

ফাদার হ্যারিসের অপরিসীম ক্লান্তি লাগছিল। মেয়ে দুটোর জন্য এক ধরনের দুঃখ বোধ করলেন তিনি। বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেল; এখন যাই রে শোভা—'

ফাদার হ্যারিস আবার সাইকেলে উঠে পড়লেন।

শোভারা ঝিলের দিকে চলে গেল।

চার

মিশনে ফিরে প্রথমে খানিকটা জিরিয়ে নিলেন ফাদার হ্যারিস। পিলে বাড়িতে ছিল না; সে স্কুলে গেছে। স্কুল বসে সকালে। দুর্গা এখন রান্নাঘরে; সেখান থেকে হাতা খুন্তির ঠুং ঠাং শব্দ ভেসে আসছিল।

জিরিয়ে নেবার পর কুয়োতলায় গিয়ে স্নান সেরে এলেন ফাদার হ্যারিস; পোশাক বদলে একটা খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিলেন। তারপর লেখার টেবলে গিয়ে বসলেন।

এ দেশে তিন ধরনের মিশনারী দেখা যায়। একদল আসেন শুধু প্রীচিং অর্থাৎ খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আরেক দল মেডিক্যাল সারভিস নিয়ে; তাঁরা ডাক্তার, আর্ত মানুষের সেবাই তাঁদের মিশন। তৃতীয় দলটি আসেন এডুকেশন সারভিস নিয়ে; তাঁরা শিক্ষক; অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য তাঁদের জীবন নিবেদিত। ফাদার হ্যারিস এই শেষ দলের।

ছত্রিশ বছর আগে রাজানগরে এসে এখানকার মিশন স্কুলে ইংরেজি আর ম্যাথামেটিকস পড়াবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ফাদার হ্যারিস। ইদানীং দু বছর হল নিয়মিত ক্লাস নেন না; ইচ্ছা হলে মাঝে মধ্যে পড়িয়ে আসেন। তবে লেখার অভ্যাসটা তাঁর দীর্ঘকালের। রোজ দু চারটে পাতা না লিখতে পারলে খুব খারাপ লাগে। প্রথম প্রথম ইংরেজিতেই লিখতেন, পরে বাঙলা ভাষাটা ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর বাঙলাতেও লেখা শুরু করেছেন; আজকাল বাঙলাতেই বেশি লিখছেন।

লেখার এই টেবলটার মুখোমুখি এবং ডানদিকে দুটো জানলা।

ডাইনের জানলা দিয়ে তাকালে ওধারের স্কুলবাড়ি, হোস্টেল আর চার্চ চোখে পড়ে। এখন স্কুলবাড়িটার ঘরে ঘরে ক্লাস চলছে। একটা খয়েরী রঙের শঙ্খচিল চার্চের মাথায় যে সাদা ধবধবে ক্রুশ রয়েছে সেটা ঘিরে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। আর সামনের জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যায়, ধানের খেত। অঘ্রানের শেষাশেষি এই সময়টায় মাঠে অবশ্য ধান নেই ; শূন্য প্রান্তর দিগন্ত পর্যন্ত গা এলিয়ে পড়ে আছে।

শেষ হেমন্তের ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকিয়ে ফাদার হ্যারিস ভাবতে লাগলেন কী লিখবেন। বিষয়বস্তুর অবশ্য অভাব নেই। সামাজিক বা অর্থনীতিক হাজারটা সমস্যা হাতের কাছেই রয়েছে। কিংবা ওই ছোকরাগুলো অতীন লেলো বল্টু বিশে ইত্যাদিদের নিয়ে যে লস্ট জেনারেসন, তাদের সম্বন্ধেও কিছু লেখা যায়। কিংবা হাল্কা ধরনের কোন রম্যরচনা। মনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নাড়াচাড়া করতে করতে শেষ পর্যন্ত ফাদার হ্যারিস স্থির করে ফেললেন, আজকের লস্ট জেনারেসনকে নিয়েই লিখবেন। রাজানগরের ওই ছোকরাগুলো তাঁকে অস্থির অসুস্থ উদভ্রান্ত করে তুলেছে।

লিখতে শুরু করবেন, বাধা পড়ল। প্লেটে করে দু টুকরো স্যাঁকা পাউরুটি, ছানা আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকল দুর্গা। ক'বছর ধরে ফাদার হ্যারিসের এই হল ব্রেকফাস্টের তালিকা। ডিম ঘি মাখন ইত্যাদি ফ্যাট জাতীয় খাদ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ এবং নিষিদ্ধ, কেননা তাঁর রক্তের চাপ এবং ব্লাড ক্লোসটারেলটা অনেক কাল একটা বিপজ্জনক জায়গায় আটকে আছে। এ খবরটা দুর্গা জানে এবং সে সম্বন্ধে তার সতর্ক দৃষ্টি।

ছানা-টানা খেয়ে ফাদার হ্যারিস সবে চায়ে চুমুক দিয়েছেন, আচমকা ডাকটা কানে এল, 'হরিশ দাদু—'

ঘাড় ফেরাতেই ফাদার দেখতে পেলেন, ডানদিকের জানালার বাইরে টুকটুকি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দাঁড়িয়ে নেই, জানালার মোটা মোটা গারাদ দু হাতে ধরে সমানে দুলছে।

টুকটুকির বয়স ছয় সাত, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় টানা চোখ, ছোট্ট কপাল, সরু চিবুক ; গায়ের রঙ টুকটুকে। লাল রঙের ওপর সবুজ লতাপাতা-আঁকা একটা ফ্রক তার গায়ে ; ফ্রকের ওপর হলুদ সোয়েটার।

ফাদার হ্যারিসের মনে পড়ে গেল, ঝিলপাড় থেকে ফেরার পথে টুকটুকিদের বাড়ি যাবেন ভেবেছিলেন ; একেবারে ভুলে গেছেন।

এই মেয়েটার বয়েস যখন তিন চার তখন থেকেই আড়াআড়ি বড় রাস্তা পেরিয়ে এখানে চলে আসছে। ওই জানালাটা ধরে দাঁড়ায় সে, কতরকম কথা বলে। টুকটুকির ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে তাঁর।

ফাদার হ্যারিস হেসে হেসে বললেন, এই যে 'হার ম্যাজেস্টি, বাইরে কেন ? ভেতরে আয়—'

'উঁহু উঁহু—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে লাগল টুকটুকি। আমি ভেতরে যাব না, যাব না, যাব না।'

'কেন রে ?'

'তোমার ওপর রাগ করেছি।'

ফাদার হ্যারিস রগড়ের গলায় বললেন, 'খুব রাগ ?'

'হ্যাঁ—' গলার সুরে লম্বা টান দিয়ে মাথাটা ডানদিকে অনেকখানি হেলিয়ে দিল টুকটুকি।

ফাদার হ্যারিস কপট ভয়ের গলায় বললেন, 'তবে তো খুবই বিপদের কথা। বলেই ছড়া কাটলেন :

'রাগ করেছে রাগুনি,
এলো মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এক্ষুনি,
তুলে নিয়ে যাবে তক্ষুনি।'

টুকটুকি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ওই ছড়াটা বলবে না—'

'কেন রে ?'

'ওটায় অসভ্য অসভ্য কথা আছে।'

ফাদার হ্যারিস কৌতুক বোধ করলেন। 'বললেন, বরের কথাটা বুঝি অসভ্য কথা?'

টুকটুকি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আর অসভ্য কথা বলব না, এখন ভেতরে আয়।'

'না। আমি জানি তুমি কাল হাসপাতাল থেকে এসেছ। আমাদের বাড়ি যাওনি কেন?'

'ও, এই জন্যে রাগ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল অনেক রাত্তিরে ফিরেছি, অত রাত্তিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না।'

'আজ সকালে বেড়াতে গিয়েছিলে?'

'হুঁ—'

'আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?'

'তোরা তখন ঘুমুচ্ছিলি, তাই ডাকিনি। কাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি তোকে সাইকেলে তুলে নিয়ে যাব।'

'উঁহু উঁহু—' নাকের ভেতর শব্দ করতে করতে সমানে দুলতে লাগল টুকটুকি।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কী হল?'

'আমাকে এক্ষুনি বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।'

'লক্ষ্মী সোনা তো, আমি এখন একটু লিখব।'

'লিখতে হবে না, আগে আমাকে নিয়ে চল। আদুরে ভঙ্গিতে হাত পা ছুঁড়তে লাগল টুকটুকি।

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না। চল্ লেখা আজ মাথায় থাক।'

ফাদার হ্যারিস টুকটুকিকে সাইকেলে তুলে নিজে উঠতে যাবেন, দুর্গা সামনে এসে দাঁড়াল। হাত-পা নেড়ে দুর্বোধ্য স্বরে সে যা

বলতে চাইল তা এই রকম ; এত বড় একটা অপারেশন গেছে, এখন ছোটাছুটি করা চলবে না, এখন পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে।

মুখ কাঁচুমাচু করে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'হার ম্যাজেস্টি গোঁ ধরেছে, নিয়ে বেরুতেই হবে। কাল থেকে গুড বয় হয়ে যাব।' দুর্গাকে কোনরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বড় রাস্তায় এসে ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনদিকে যাবি ?'

টুকটুকি বলল, 'বাজারে চল। লবঞ্চুস কিনে দেবে।' এই জিনিসটার ওপর তার দারুণ লোভ।

খানিকটা যাবার পর টুকটুকির বকবকানি শুরু হল। 'এটা কি গাছ হরিশ দাদু ?' 'ওই লোকটা ট্যারা কেন ?' 'ওই পাখিটার নাম কী ?' 'ওই ছেলেটার জ্যাঠামশায় কে ?' ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। জগতের সব বিষয়েই তার অজস্র কৌতূহল। ফাদার হ্যারিস সাইকেল চালাতে চালাতে উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন।

বকতে বকতে একসময় হঠাৎ চুপ করে গেল টুকটুকি। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'জানো! হরিশ দাদু তুমি ছিলে না, আমাকে এতদিন কেউ বেড়াতে নিয়ে যায় নি। কে নিয়ে যাবে বল, দাদু তো দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে, উঠতে পারে না।'

ফাদার হ্যারিস জানেন টুকটুকির দাদু শশধর ভট্টাচার্যের ডানদিকটা পক্ষাঘাতে অসাড়, পাঁচ বছর ধরে সে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। বললেন, 'দাদু না হয় উঠতে পারে না, মা তো আছে।'

'মা কোথাও বেরোয় না। ঘরের কোণে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।'

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে পড়তে ফাদার হ্যারিস অল্প ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে টুকটুকি, তোর বাবা এর মধ্যে এসেছিল ?'

না ; বাবা আর নাকি আসবে না।'

ফাদার হ্যারিস চমকে উঠলেন, 'কে বললে ?'

টুকটুকি বলল, 'দাদু বলছিলেন।'

টুকটুকির বাবা আর মা'র মধ্যে একটা গোলমাল চলছিল ; সেটা কি বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁচেছে ? গভীর বিষাদে ফাদার হ্যারিসের মনটা ভরে যেতে লাগল। তবে এ নিয়ে টুকটুকিকে কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি।

টুকটুকি আবার বলল, 'মা আর দাদু তোমাকে যেতে বলেছে।'

'যাব ; নিশ্চয়ই যাব।' দূরমনেস্কের মতো মাথা নাড়লেন ফাদার হ্যারিস।

বাজারে এসে শুধু লবঞ্চুসই নয়, লাল রিবন আর নাইলনের একটা পুতুলও কিনল টুকটুকি। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কি, খুশী তো ?'

'হুঁ—' একমুখ হেসে ঘাড় কাত করল টুকটুকি, 'এবার স্টেশনের দিকে চল।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আমার শরীরটা তো খারাপ, এখন, আর স্টেশনে যাব না ; আবার কাল, কেমন ?'

পুতুল-টুতুল পেয়ে মেজাজটা ভালই ছিল। টুকটুকি বলল, 'ঠিক আছে। কাল কিন্তু আসবে ; মনে থাকে যেন।'

ফেরার পথে বাজারের শেষ মাথায় মতি সাহার দিশী মদের দোকানের কাছে আসতেই ফাদার হ্যারিস লেলো আর তার দলটাকে দেখতে পেলেন। লেলোকে মনে মনে খুঁজছিলেনও। হঠাৎ কি হয়ে গেল, সাইকেল থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন ফাদার, টুকটুকিকেও নামালেন, তারপর সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

লেলো এবং তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লেলোর চোখের দৃষ্টি এখন স্থির, নিষ্পলক ; সেখানে এক ধরনের ভয়ের ছায়া পড়েছে। হয়তো কাল রাতের কথা ভাবছিল সে।

ফাদার হ্যারিস কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে লেলো, কেমন আছিস ?'

লেলোর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ ; তামাটে রঙ। চোখের মণি বাদামী রঙের, মুখ লম্বা ধাঁচের, রুক্ষ ঘন চুল নিতান্ত অবহেলায় মাথার পেছন দিকে উল্টে দেওয়া, গালে একটা কাটা দাগ, হাইট প্রায় পোনে ছ'ফুট, গালে চওড়া জুলপি, বেতের মতো নমনীয় অথচ দৃঢ় শরীর। এই মুহূর্তে তার পরনে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছাপ-মারা কলারওলা গেঞ্জি আর নীচের দিকে ছড়ানো প্যান্ট; পায়ে জবড়জঙ নক্সাওলা চপ্পল, ডান হাতে স্টেনলেশ স্টীলের একটা বালা, ডান হাতে ঢাউস একটা ঘড়ি কব্জির কাছে ঢলঢল করছে। তার সঙ্গীদেরও প্রায় একই রকম পোশাক।

লেলো ফাদার হ্যারিসের কথার উত্তর দিল না; সতর্কভাবে শুধু তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত এক পলক তাকে দেখে নিয়ে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছিস।'

লেলো এবারও চুপ।

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের বাড়ির খবর কী ? বাবা ভালো আছে ?'

চাপা গলায় লেলো উত্তর দিল, 'বাড়ির খবর রাখি না।'

লেলোর বাবা রাজানগরে যে বরফকলটা আছে সেখানকার কেরানী। ছ'সাতটা ছেলেমেয়ে তার। মাগ্‌গীভাতা সমেত এক শ সাতাত্তর টাকা চুয়াত্তর পয়সায় আট ন' জনের সংসার চালাতে তার জিভ বেরিয়ে যায়। হাসপাতালে যাবার অনেক আগেই অবশ্য ফাদার হ্যারিস শুনেছিলেন, লেলো ওদের বাড়িতে থাকে না, বাপ-মা'র সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক বা যোগাযোগও রাখে না।

ফাদার হ্যারিস শুধোলেন, 'আজকাল কী করছিস ?'

লেলোর চোখ থেকে সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছিল, তবে সতর্ক ভাবটা আছেই। সে বলল, 'কী আবার করব—'

একটু চুপ করে থেকে ফাদার হ্যারিস হঠাৎ বললেন, 'তোর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

লেলোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল, চোয়াল শক্ত। অস্পষ্টভাবে সে বলল, 'কী দরকার?'

'তোর সঙ্গে এক হাত পাঞ্জা লড়ব—'

ফাদার হ্যারিসের স্বভাবে এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে। হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা তিনি করে বসেন যাতে এ শহরের মানুষদের দারুণ মজা লাগে। তাঁর এই পাঞ্জা ব্যাপারটা নতুন না; ছেলেছোকরাদের ডেকে ডেকে হাসপাতালে যাবার আগে প্রায়ই বলতেন, 'কি সব হেল্‌থ্‌ করেছিস! ইয়াং ম্যান—টোকা দিলে উড়ে যাবি। সিক্সটির কাছে আমার বয়েস; লড়ে ভাখ এক হাত পাঞ্জা! স্বাস্থ্য সবার ওপরে, বুঝলি?' এই লেলোর সঙ্গেও আগে অনেকবার পাঞ্জা লড়েছেন।

লেলোর দৃষ্টি স্বাভাবিক হল, চোয়ালও নরম হয়ে আসছে। নাঃ, ফাদার কালকে সেই ঘটনাটার ধার দিয়েই যাচ্ছেন না। অনেকখানি সহজভাবে সে বলল, 'এই কথা! আই অ্যাম রেডি ফাদার। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি আমার সঙ্গে পারবে না।'

'কোনদিন আমার সঙ্গে পাঞ্জায় জিতেছিস?'

'লাও ঠ্যালা, কোনদিন জিতিনি বলে এবারও হেরে যাব ভেবেছ?'

লেলোর চোখের ভেতর তাকিয়ে ফাদার হ্যারিস আস্তে করে বললেন, 'কেন, এর মধ্যে শক্তি খুব বাড়িয়ে ফেলেছিস নাকি?'

কি ভাবল লেলো, কে জানে। বলল, 'তা একটু বেড়েছে।'

'দেখা যাক; কতটা বেড়েছে।' ফাদার হ্যারিস হাসলেন।

লেলো বলল, 'তুমি অসুস্থ লোক; এই সবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছ। পাঞ্জাটা না লড়লেই পারতে।'

ফাদার হ্যারিস জেদ ধরলেন, লড়বেনই। অগত্যা মতি সাহার

মদের দোকান থেকে একটা উঁচু টুল এল। দু জনে টুলটার ওপর কনুই রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা ধরলেন।

এখন, এই বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় বাজারের রাস্তাটা গম গম করছে। চারদিকে প্রচুর লোকজন। মজা দেখতে সবাই ছুটে এসেছে এবং ওদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

শরীরের সবটুকু শক্তি ডান হাতের কব্জিতে জড়ো করে লেলো ফাদার হ্যারিসের হাতটাকে নুইয়ে দিতে চাইছিল। তার দাঁতে দাঁত চাপা, চোয়াল শক্তবদ্ধ, গলার শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠেছে, কপালের দু পাশে দুটো রগ দপ দপ করছিল; চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছিল।

ফাদার হ্যারিসের মুখও লাল হয়ে উঠেছিল; শরীরের সব রক্ত তার মুখে গিয়ে জমা হয়েছে যেন। হাজার হোক লেলো পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটা টগবগে জোয়ান ছেলে আর তাঁর বয়েস ষাট। অবশ্য শুধু বয়েস হলেই কথা ছিল না, তলপেটে এগারো ইঞ্চি লম্বা অপারেশনটা তাঁকে অনেকটাই নির্জীব করে ফেলেছে। আগে হলে চোখের পলকে লেলোকে হারিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। যতই অসম্ভব হোক, লেলোর মতো একটা বজ্জাত শয়তানের কাছে কোনমতেই হেরে যাওয়া যায় না।

চারদিকের ভিড় থেকে নানারকম উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য ভেসে আসছিল।

'লড়ে যাও গুরু—'

শালার কব্জি ঢিলে করে দাও—' ইত্যাদি।

চারপাশের লোকজনের প্রায় সবাই ফাদার হ্যারিসের পক্ষে। লেলোর চার পাঁচটা সঙ্গীই তার সমর্থক।

যাই হোক, একবার লেলো ফাদারের হাতটা নুইয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণে ফাদার তাঁর হাত নুইয়ে ফেলেছেন। পনের কুড়ি মিনিট এ-

ভাবে চলবার পর ফাদার হ্যারিস এক ঝটকায় লেলোর হাতটা টুলের উপর ফেলে দিলেন।

জনতা চিৎকার করে উঠল, 'সাবাস গুরু, বুড়ো বয়েসে ভেলকি দেখিয়ে দিলে।'

'ফাদার যেন বাঘের বাচ্চা—'

লেলো জোরে জোরে হাঁপাচ্ছিল। ফাদার কপালের ঘাম মুছে বড় করে শ্বাস টানলেন। তারপর ভিড়টা পাতলা হয়ে এলে লেলোর কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'পারলি না তো—'

লেলো জবাব দিল না।

ফাদার হ্যারিস আবার বললেন, 'এখনও আমি মরে যাই নি—এই কথাটা মনে রাখিস, ভালো হবে। আর একটা কথা—' লেলোর মুখের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফাদার বলতে লাগলেন, 'শিবানীর পেছনে আর লাগিস না। মেয়েটা বড় দুঃখী—'

লেলো চমকে উঠল। এই পাঞ্জা লড়াটা নেহাতই তবে ফাদারের একটা ছেলেমানুষি খেয়াল নয়। লেলোর চোখ আবার ধারাল হয়ে উঠল; দাঁতে দাঁত চাপল সে। গলার রক্তবাহী শিরাগুলো ফুলে উঠতে লাগল তার।

ফাদার আর দাঁড়ালেন না; টুকটুকিকে সাইকেলে তুলে মিশনের দিকে চালিয়ে দিলেন।

পাঁচ

মিশনের কাছে এসে ফাদার হ্যারিস যখন কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকতে যাবেন, টুকটুকি বলল, 'আমাকে এখানে নামিয়ে দাও।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এখানে কেন? ভেতরে চল্—'

'না, আমি এখন বাড়ি যাব। সেই কখন এসেছি, মা বকবে।'

'ঠিক আছে, তুই তা হলে যা। দাদু আর মাকে বলিস, সন্ধ্যেবেলা তোদের বাড়ি যাব।'

'আচ্ছা।'

সাইকেল থেকে নামিয়ে দিতেই পুতুল আর লবঞ্চুসের ঠোঙাটা বুকের কাছে চেপে ধরে টুকটুকি ছুট লাগাল। রাস্তার ওপারে কোনাকুনি খানিকটা গেলেই ওদের লাল রঙের বাড়ি। যতক্ষণ না টুকটুকি তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকল, ফাদার হ্যারিস দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে মিশন কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্তে তাঁর সেই ছোট্ট বাড়িটায় চলে এলেন।

এখন দুপুর, প্রায় বারোটার মতো বাজে। সূর্যটা আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে বেয়ে সোজা মাথার ওপর এসে উঠেছে।

সকালবেলা মিশনস্কুলে প্রাইমারি ক্লাসগুলো নেওয়া হয়। মর্ণিং সেকসানের ছুটি হয়ে গেছে; পিলেকে তাই বাড়িতে পাওয়া গেল। ও ক্লাস থ্রী-তে পড়ে। চান-টান করে সে ফিটফাট হয়ে আছে। খেলার মাঠের ওপারে স্কুল বাড়িটায় এখন ডে-স্কুল বসেছে, মর্ণিং স্কুল ভাঙলে উঁচু ক্লাসগুলো নেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে পিলিকে নিয়ে খেতে বসে গেলেন ফাদার হ্যারিস। খাওয়াদাওয়ার পর টানা একটি ঘুম দিয়ে যখন উঠলেন বিকেল হয়ে গেছে। রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতো; দূরে পাতলা ধোঁয়ার

মতো হিম পড়তে শুরু করেছে। আকাশ জুড়ে অগুনতি পাখি উড়ছিল; মনে হচ্ছিল লাল-নীল-হলুদ-সবুজ, নানারঙের কাগজের টুকরো কেউ যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। আলস্যভরে কিছুক্ষণ শেষ হেমন্তের বিকেলটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফাদার হ্যারিস, তারপর মুখটুখ ধুয়ে এসে লেখার টেবলে বসলেন। ও বেলা টুকটুকির জন্য একটি বর্ণও লিখতে পারেন নি। দেখা যাক, এবার কিছু লেখা যায় কিনা।

টেবলে বসতে না বসতেই দুর্গা চা বিস্কুট আর সন্দেশ দিয়ে গেল। ওকে কিছু বলতে হয় না; সর্বক্ষণ মেয়েটা তাঁর দিকে সজাগ চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে। কখন তাঁর কী দরকার, সব জানে দুর্গা।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্কুলবাড়িতে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল। হৈ-চৈ হুল্লোড় করতে করতে ছেলেরা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ গেল হোস্টেলে; যাদের বাড়ি এই রাজানগরেই তারা কম্পাউণ্ডের বাইরে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল। একটু পর গোটা জায়গাটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেল।

সকালবেলা ফাদার হ্যারিস স্থির করেছিলেন, লস্ট জেনারেসন নিয়ে কিছু লিখবেন। মনে মনে ভাবনাটাকে সবে গুছিয়ে এনেছেন সেইসময় আবার বাধা পড়ল। সামনের জানালার কাছ থেকে কেউ ডেকে উঠল, 'বাবা সাহেব—'

চমকে ফাদার হ্যারিস মুখ তুললেন। জানালার বাইরে নিবারণ হোড় দাঁড়িয়ে আছে। নিবারণের বয়েস বাহান্ন তিপ্পান্ন। দু-এক বছর কম বেশিও হতে পারে। ভাঙাচোরা মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। সারা গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশি; চোকো মুখে ঘোলাটে চোখ; মাথায় ধোঁয়াটে রঙের তেলহীন রুক্ষ চুল। পরনে তালিমারা লংক্লথের হাফ শার্ট আর পাজামা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। জীবন সংগ্রাম বলে একটা শব্দ আছে, সেটা নিবারণকে ভেঙেচুরে যেন একাকার করে দিয়েছে। লোকটা এখানকার 'রামধনু টকীজে'র মেশিন অপারেটার।

চোখাচোখি হতেই অনেকখানি ঝুঁকে নিবারণ দু হাত কপালে ঠেকাল, 'নমস্কার বাবাসাহেব।'

আজ আর লেখার আশা নেই। কলমের মুখ বন্ধ করতে করতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'নমস্কার। কি খবর নিবারণ—'

'আজ্ঞে বাবাসাহেব, একটু ভেতরে আসব?'

'নিশ্চয় আসবে।'

নিবারণ ওধারের দরজা দিয়ে ভেতরে এসে বসল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'তারপর বল—'

হাত কচলাতে কচলাতে নিবারণ বলল, 'তার আগে একটু চা—'

'অবশ্যই—' ফাদার হ্যারিস পিলেকে ডেকে দুর্গাকে চা দেবার কথা বলতে যাবেন, তার আগে দুর্গা একটা প্লেটে কালকের সেই মিষ্টি আর চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওকে কিছু বলতে হয় না, ও জানে নিবারণ এখানে এসে কিছু না খেয়ে উঠবে না।

মিষ্টিগুলো প্রায় গোগ্রাসে গিলতে লাগল নিবারণ। আপাত চোখে লোকটাকে দারুণ লোভী মনে হয়। আসলে ফাদার জানেন, কোনদিনই নিবারণ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না; মাঝে মধ্যে সে তাঁর কাছে আসে ভালোমন্দ একটু খেতে।

নিবারণের খাওয়া দেখতে দেখতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল ফাদার হ্যারিসের। কোমল গলায় বললেন, 'খুব খিদে পেয়েছিল, না?'

মুখে সন্দেশ বোঝাই। জড়ানো স্বরে নিবারণ বলল, 'হ্যাঁ।'

ফাদার হ্যারিস দুর্গার কাছ থেকে আরো ক'টা সন্দেশ এনে নিবারণের প্লেটে দিলেন।

নিবারণ বলল, 'আবার কেন?' বলেই মিষ্টিগুলো চোখের পলকে মুখে পুরে ফেলল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'একদিন আমার এখানে চাট্টি ডালভাত খাও নিবারণ। অনেকদিন একসঙ্গে বসে খাই নি। কবে তোমার সুবিধে হবে?'

নিবারণ একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল। কৃতজ্ঞ সুরে বলল, 'আমার আবার সুবিধে অসুবিধে ; আপনি যেদিন আজ্ঞা করবেন—'

ফাদার হ্যারিস একটু ভেবে বললেন, 'আসছে রবিবার দুপুরবেলা এসো কেমন ?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

'এবার বল তোমার খবরটবর কী—'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে নিবারণ বলল, 'একটু খারাপ খবরই আছে বাবাসাহেব—'

ফাদার হ্যারিস ওই ঘাড় চুলকানো দেখেই খানিকটা আন্দাজ করেছিলেন। এই লক্ষণ তাঁর অজানা নয়। বললেন, 'কি ব্যাপার, বৌমা আবার সন্তান-সম্ভবা নাকি ?'

বোকাটে ধরনের হেসে নিবারণ বলল, 'হে-হে, ভগবানের মার বাবাসাহেব—'

'আমার নাতি-নাতনীর সংখ্যা এখন ক'টি ?'

নিবারণ মুখ নীচু করে বলল, 'যে আসছে তাকে নিয়ে এগার।' তার পরেই হঠাৎ কি খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এর ভেতর দুটো হয়েছে ব্রিটিশ আমলে। গরমেণ্ট 'দো আউর তিন বাচ্চে'র কথা বলবার আগেই হয়েছে ছ'টা। তার পর অবশ্যি—হে-হে, তিনটে—'

লোকটা, ফাদার হ্যারিস অনেক দিন ধরে দেখে আসছেন, বেশ আমুদে টাইপের। অভাবের আর সাংসারিক নানা দায়-দায়িত্বের চাপে আমোদ-আহ্লাদ বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। যেটুকু তলানি অবশিষ্ট আছে ফাদার হ্যারিসের কাছে এলে কখনও কখনও ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'নিবারণচন্দ্র, ও ব্যাপারটা এবার নিবারণ কর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাসাহেব ; এ-ই লাস্ট, এর পর 'ছোট পরিবার সুখী পরিবারে'র বাবুদের কাছে গিয়ে স্রেফ কাটিয়ে আসব।'

ফাদার হ্যারিস হাসলেন। নিবারণকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম। এখন বল আর কিছু দরকার আছে?'

নিবারণ জামা দিয়ে মুখ মুছে নখ খুঁটতে লাগল। এ লক্ষণটাও ফাদার হ্যারিসের খুবই চেনা। বললেন, 'কিছু টাকাপয়সা চাই নাকি?'

'হ্যাঁ মানে, আপনার বৌমাকে ডাক্তার-টাক্তার—'

'কত চাই?'

'কুড়ি পঁচিশ হলেই চলে যাবে।'

এর আগেও কতবার যে নিবারণ টাকা নিয়ে গেছে তার হিসেব নেই। ওকে টাকা দেওয়া মানে একেবারেই দেওয়া; কোনকালেই ফেরত পাবার আশা নেই। ফাদার হ্যারিস টিনের একটা বাক্স থেকে পঁচিশটা টাকা বার করে এনে নিবারণকে দিলেন।

টাকা পেয়েই নিবারণ উঠে পড়ল। বলল, 'আমি তা হলে এখন যাই—'

'আচ্ছা—'

'রবিবার আসছি কিন্তু—'

'ঠিক আছে।'

নিবারণ চলে যাবার পর ফাদার হ্যারিস ভাবনাটাকে লেখার মধ্যে গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না, মন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো হয়ে গেছে। টেবলের ওপর পেপার ওয়েট ছিল; অন্যমনস্কের মতো দু আঙুলে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি দেখলেন জানালার বাইরে শেষ হেমন্তের বিকেল লম্বা লম্বা পায়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যে ম্যাড়মেড়ে বিষণ্ণ রোদটুকু এখানে-ওখানে গাছপালার মাথায় আলগা-ভাবে লেগে ছিল, জাল গুটনোর মতো কেউ যেন একটানে সেটাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বসে থাকতে থাকতে ফাদার হ্যারিসের হঠাৎ টুকটুকিদের কথা মনে পড়ল। আজ লেখা যখন হবেই না তখন

ওদের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এলে হয়। ভাবামাত্র উঠে পড়লেন ফাদার হ্যারিস। পায়ে চপ্পল লাগিয়ে বেরুতে যাবার মুখে দুর্গা সামনে দাঁড়াল। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল আজ যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করেছেন ফাদার, প্রচুর পরিশ্রম গেছে, রোগা শরীরে এত ধকল সইবে না। এখন তাঁর কিছুতেই বেরুনো চলবে না।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'বেশিদূরে যাচ্ছি না, খুব কাছেই ; ওই টুকটুকিদের বাড়ি। যাব আর আসব। রাগ করিস না, মা জননী—'

দুর্গা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকল। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এই শেষ বার ; আর তোর কথার অবাধ্য হব না।' দুর্গার মাথায় হাত বুলিয়ে ফাদার বেরিয়ে পড়লেন।

ছয়

টুকটুকিদের বাড়িটা মাঝারি ধরনের। সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত বাগান। আগে ফুলটুল ফুটত, ইদানীং ফুলগাছটাছ আর নেই; অবহেলায় আর অযত্নে চারদিকে প্রচুর ঘাস আর আগাছা জন্মেছে।

বাগান পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই পরপর তিনখানা ঘর। মাঝখানে ছোট্ট উঠোন; তার ওধারে রান্নাঘর, কুয়ো, স্নানের ঘর।

বাড়িতে ঢুকে ফাদার হ্যারিস উঁচু গলায় ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, 'টুকটুকি কোথায় রে, টুকটুকি—'

মাঝখানের ঘরটা থেকে টুকটুকি ছুটে বেরিয়ে এল। পিছু পিছু ওর মা—প্রতিমা। প্রতিমার ডাকনামটাও ফাদার হ্যারিসের জানা—টুলু।

টুকটুকি চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'ফাদার দাদু এসেছে। ফাদার দাদু এসেছে—'

ফাদার হ্যারিস প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ও যখন টুকটুকির মতো ছোট তখন থেকেই ওকে দেখে আসছেন। এখন সাতাশ আটাশের মতো হবে প্রতিমার বয়েস। এটাই টগবগে সজীব থাকার সময়। কিন্তু প্রতিমার মধ্যে সজীবতা বলতে কিচ্ছু নেই। সারা গায়ে যেন তার বিষাদ মাখা। চোখের তলায় গাঢ় কালির দাগ; তিনমাস আগেও যে স্বাস্থ্য ছিল তা ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে; কণ্ঠা আর গলার হাড় চামড়ার তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চুল উঠে উঠে কপালটা মস্ত বড় দেখায়।

প্রতিমা বলল, 'আসুন ফাদার কাকা—'

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'চেহারার এ কি হাল করেছিস টুলু!'

প্রতিমা উত্তর দিল না ; তার মুখে মলিন একটু হাসি ফুটল শুধু।

ফাদার হ্যারিস আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, ডানধারের ঘরটা থেকে একটা দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে, রাজা হরিশ্চন্দ্র নাকি ?'

গলাটা যাঁর তিনি টুকটুকির দাদু চন্দ্রমোহন—চন্দ্রমোহন সান্যাল। চন্দ্র তাঁর যৌবনের বন্ধু। ছত্রিশ বছর আগে যখন তিনি এদেশে এসেছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে চন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গতা। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রাজা হরিশচন্দ্রই—' ওই নামেই চন্দ্রমোহন তাঁকে ডেকে থাকেন।

চন্দ্রমোহনের গলা আবার শোনা গেল, 'এ ঘরে এসো—'

'আসছি—' ফাদার হ্যারিস ডান দিকের ঘরে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে টুকটুকি আর প্রতিমাও এসেছিল। প্রতিমা অবশ্য ঘরে ঢুকল না। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে বিষণ্ণ করুণ একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

পুরনো আমলের নক্সাকরা প্রকাণ্ড একটা খাটের মাঝখানে চন্দ্রমোহন শুয়ে আছেন। ফাদার হ্যারিসেরই সমবয়সী হবেন। এক সময় মুগুর-টুগুর ভাঁজতেন ; দারুণ স্বাস্থ্য ছিল। বাজি ধরে তিন সের মাংস আর পঞ্চাশ ষাটটা রসগোল্লা যখন তখন খেয়ে ফেলতেন। বিশ পঁচিশ বছর আগের চন্দ্রমোহনকে এখন আর চেনাই যায় না ; এখন তিনি সেদিনের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে মোটামুটি ভাল চাকরি করতেন চন্দ্রমোহন। বছর পাঁচেক আগে একটা বড় রকমের স্ট্রোক হয়েছিল ; তার পরই প্যারালিসিসে ডান দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে চাকরি শেষ হবার আগেই তাঁকে রিটায়ার করতে হয়েছিল। এখন পেনসনের কিছু টাকা আর এই বাড়িটুকুই ভরসা। স্ত্রী নেই, আট ন' বছর আগে মারা গেছেন। মেয়ে প্রতিমা আর নাতনী টুকটুকিকে নিয়ে তাঁর সংসার।

কে কেমন আছেন, ইত্যাদি কুশল প্রশ্নের পর চন্দ্রমোহন বললেন, 'তোমাকে ক'দিন ধরে আমি খুব খুঁজছি—'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কেন চন্দ্র ?'

'তুমি হাসপাতালে ছিলে ; তাই জানো না টুলুটার কী সর্বনাশ হয়ে গেছে ।' বলতে বলতে গলার স্বর কাঁপতে লাগল চন্দ্রমোহনের ।

ফাদার হ্যারিস টুকটুকির কাছে ওবেলাই অস্পষ্ট আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল। চন্দ্রমোহনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে বললেন, 'কী হয়েছে ?'

'তুমি তো জানতে সুশীলরা ডাইভোর্সের মামলা করেছিল—'

সুশীল প্রতিমার স্বামীর নাম। ফাদার হ্যারিস বললেন, 'জানি—'

'সেই মামলায় ওরা জিতে গেছে ।'

ফাদার হ্যারিস অত্যন্ত অবসাদ বোধ করতে লাগলেন। তিনি সবই জানেন। প্রতিমার বিয়েটা আদৌ সুখের হয় নি। বিয়ের পর এক বছরও কাটে নি ; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটুও বনিবনা হচ্ছিল না ওদের, দিনরাত ঝগড়াঝাটি ; চিৎকার চেঁচামেচি। এই রকম বিস্ফোরক অবস্থায় শত্রুপক্ষের মতো এক বাড়িতে বাস করা অসম্ভব। প্রতিমা নিজেই একদিন বাবার কাছে চলে এসেছিল। তারপর থেকে এখানেই আছে। যখন এসেছিল তখন টুকটুকি পেটে ; বেশ অ্যাডভান্সড স্টেজ। টুকটুকির জন্মের পর সুশীল বার দুই মাত্র মেয়েকে দেখতে এসেছিল। এবং এক পলক চোখের দেখা দেখেই চলে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে কারো সঙ্গে একটা কথাও বলে নি সে, এক কাপ চা পর্যন্ত খায় নি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির কারণটা কী, প্রতিমা কোনদিনই স্পষ্ট করে বলে নি। খুব চাপা ধরনের মেয়ে সে। তবে টুকরো টুকরো ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে সে যা জানিয়েছে তা এইরকম। বিয়ের আগেই অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সুশীল ঘোরাঘুরি করত ; মেয়েটা নাকি

তার ছেলেবেলার বান্ধবী। তাকে নিয়ে একবার নাকি ওয়ালটেয়ার না পুরী কোথায় যেন দিনকয়েকের জন্য উধাও হয়েছিল সুশীল। যার সঙ্গে সম্পর্ক এত গভীর তাকে বিয়ে না করে কেন সে প্রতিমাকে বিয়ে করেছিল, এ রহস্য বুঝবার উপায় নেই। বিয়ের পরও সুশীলের সঙ্গে তার যোগাযোগ থেকেই গেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ওই মেয়েটাই যে বিষাক্ত করে দিয়েছে এর মধ্যে সংশয় নেই।

প্রতিমা আর সুশীলের সম্পর্ক সহজ স্বাভাবিক করবার জন্য কতবার যে সুশালের কাছে গেছেন ফাদার হ্যারিস তার হিসেব নেই। তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, কাকুতিমিনতি করেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। উল্টে বছরখানেক আগে মিথ্যে এ্যাডালটারির চার্জ দিয়ে সুশীল ডাইভোর্সের মামলা এনেছে। কেসটা একতরফাই চলছিল; কেননা ব্যভিচারের অভিযোগটা এত জঘন্য এমনই অকল্পনীয় যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও ঘৃণা হয়েছিল প্রতিমার; একদিনও সে কোর্টে যায় নি। যা হবার হবে—তার মনোভাব অনেকটা এইরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক, এতদিনে পাকাপাকিভাবে ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল; আইনের দিক থেকে ওরা আর স্বামী-স্ত্রী নয়।

ফাদার হ্যারিস ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত একবার প্রতিমাকে দেখে নিলেন। প্রতিমার ঘাড় ভেঙে মুখটা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে। আগে লক্ষ্য করেন নি, এবার দেখতে পেলেন প্রতিমার কপাল এবং সিঁথি একেবারে ফাঁকা; সেখানে সিঁদুরের চিহ্ন নেই। অর্থাৎ সুশীলের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনটাকে প্রতিমাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

চন্দ্রমোহনের দিকে ফিরে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ডাইভোর্স হয়ে গেল; তারপর?'

চন্দ্রমোহন নির্জীব ভাঙা গলায় বললেন, 'সেই জন্যেই তো তোমাকে খুঁজছি।'

ফাদার হ্যারিস কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

চন্দ্রমোহন আবার বললেন, 'সুশীল টুলুকে কিছু মাসোহারা দিতে চেয়েছিল আর টুকটুকিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি কোনটাতে রাজী হই নি। শুয়োরের বাচ্চা মেয়েটার গায়ে কাদা ছিটিয়ে ভিক্ষে দিতে চায়! ভিক্ষে! এত সাহস তার! 'বলতে বলতে উত্তেজিত চন্দ্রমোহন পক্ষাঘাতে অসাড় শরীরটাকে টেনে তুলতে চাইলেন।'

তাড়াতাড়ি তাঁকে শুইয়ে দিতে দিতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ডোণ্ট বী একসাইটেড, চুপ করে শোও।'

খানিকটা শান্ত হবার পর চন্দ্রমোহন হাত বাড়িয়ে ফাদার হ্যারিসের একটা হাত ধরলেন। ভাঙা ভাঙা'শিথিল গলায় বললেন, 'শুয়োরের বাচ্চাটার অনুগ্রহ রিফিউজ করে ভালো করিনি?'

'নিশ্চয়ই।' ফাদার হ্যারিস আন্তরিকভাবেই বললেন।

কি একটু ভেবে চন্দ্রমোহন এবার বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

'বল—'

'তোমার ফ্রেণ্ড এই চন্দ্রমোহনের—' নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে চন্দ্রমোহন বলতে লাগলেন, 'চন্দ্রগ্রাস শুরু হয়ে গেছে। আমি জানি মাই ডেজ আর নাম্বারড্—'

বাধা দিয়ে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আজ তুমি খুবই ইমোসনাল; ওসব কথা এখন থাক।'

'না; এখনই তোমার শোনা দরকার।' চন্দ্রমোহন প্রায় জোরই করতে লাগলেন।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আচ্ছা বল—'

'তুমি ছাড়া আমার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই যাকে বিশ্বাস করা যায়; যার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত হতে পারি—'

বিব্রতভাবে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার কথা থাক। যা বলছিলে বল—'

চন্দ্রমোহন তাঁর হাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি দেখো, টুলু আর টুকটুকিটা যেন ভেসে না যায়।'

'মৃত্যুর কথা এখনই ভাবছ কেন? কি এমন বয়েস হয়েছে তোমার? আমার চাইতে এক বছরের ছোটই হবে।'

'আমার শরীরের অবস্থা আমার চেয়ে কে আর ভালো জানে বল—'

কথাটা ঠিকই বলেছেন চন্দ্রমোহন। তিন মাস পর ওঁকে যেরকম দেখছেন তাতে ভরসা হচ্ছে না যে চন্দ্রমোহন খুব বেশিদিন আর বাঁচবেন। ওঁর জীবনাশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

চন্দ্রমোহন ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে ছিলেন; চোখে জল চিকচিক করছিল। আঙুল দিয়ে তাঁর হাতে সস্নেহে মৃদু আঘাত দিতে দিতে গাঢ় সহানুভূতির গলায় ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ওদের জন্য তুমি ভেবো না চন্দ্র।'

আরো কিছুক্ষণ চন্দ্রমোহনের কাছে বসে থেকে ফাদার হ্যারিস একসময় উঠে পড়লেন। ততক্ষণে রাজানগরের ওপর শেষ হেমন্তের রাত কুয়াশায় সারা গা মুড়ে নেমে আসতে শুরু করেছে।

সাত

এর পর চারটে দিন ফাদার হ্যারিস এইভাবে কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলা উঠে অভ্যাসমতো রোজই তিনি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। টুকটুকি জামা-জুতো-সোয়েটার পরে মাথায় আর গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে ওদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত। ফাদার হ্যারিস টুক করে তাকে তুলে নিয়ে একদিন বেড়াতে চলে গেছেন স্টেশনের দিকে, একদিন গেছেন ঝিলের পাড়ে, বাকি দু'দিন ধানখেতের দিকে। আদিগন্ত ফাঁকা মাঠের মাঝমধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখা তাঁর বহুকালের প্রিয় শখ। যথারীতি টুকটুকি তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে। 'রোদ ওঠে কেন?' 'ঘাসের রঙ হলদে হয় না কেন?' 'ঝিঁঝিরা ঝি-ঝি করে কী বলে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। রোজই বেড়িয়ে ফিরে এসে স্নান-টান করে লিখতে বসে গেছেন ফাদার হ্যারিস। এই চারদিনে দুটো ছোট লেখা তৈরী করে ফেলেছেন। দুটো লেখাই পশ্চিম-বাংলার অর্থনীতিক বিপর্যয় এবং লস্ট জেনারেসনকে নিয়ে। দুটো ছোট লেখায় এই রকম একটা জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যাকে সঠিকভাবে ধরা যায়নি। ফাদার হ্যারিস ভেবে রেখেছেন, এই বিষয়বস্তু নিয়ে আরো বিশদভাবে চার পাঁচটা লেখা লিখবেন। লেখার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছেন; তারপর খেয়ে দেয়ে টানা একটি ঘুম। বিকেলের দিকে রাজানগরের কেউ না কেউ এসে পড়েছে; স্কুলের মাঠ পেরিয়ে চার্চ কিংবা হোস্টেল থেকে অন্য ফাদাররাও এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে গল্পটল্প করতে করতে সন্ধ্যে নেমে গেছে। ওঁরা চলে গেলে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করে রাতের খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

ছটফটে চঞ্চল স্বভাবের মানুষ ফাদার হ্যারিস। হাসপাতালে যাবার আগে সাইকেলে করে হুট হুট কতবার যে বেরিয়ে যেতেন।

কিন্তু এই চারদিন ভোরবেলা সেই একবারের বেশি বেরুতে পারেন নি ফাদার হ্যারিস ; দুর্গাই তাঁকে বেরুতে দেয় নি।

চারদিন পর আজ বিকেলে ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না ; তা ছাড়া আজ কেউ গল্প-টল্প করতে আসে নি। পিলে খেলতে চলে গেছে। একা একা মুখ বুঁজে কতক্ষণ আর থাকা যায়! পোশাক টোশাক বদলে ফাদার হ্যারিস দুর্গার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা চৌকো চটের ওপর সুতোর ফুল তুলে দুর্গা আসন তৈরি করছিল ; মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে সে তাকাল।

কাচুমাচু মুখে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'মা দশভুজা' ঘরে বসে বসে হাতে পায়ে মরচে ধরে যাচ্ছে যে। আজ একটু বেরুতে না দিলে নির্ঘাত মরে যাব।'

দুর্গা ব্যাপারটা অনুমান করে নিল। একটু হাসল সে। তারপর উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটা শাল এনে ফাদার হ্যারিসের গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিল। অর্থাৎ তিনি বেরুতে পারেন ; যাতে হিম টিম না লাগে সে জন্য ওই শালখানা সঙ্গে দেওয়া আর কি।

ফাদার হ্যারিসের মুখে হাসি ফুটল ; সারল্যমাখা শিশুর হাসি ; বললেন. 'যাক বাবা, মা জননীর পারমিসান পাওয়া গেছে।' সাইকেল নিয়ে বেরুতে যাবেন, দুর্গা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল বাজার থেকে টুকিটাকি ক'টা জিনিস—টুথপেস্ট, সাবান, কাপড় কাচার সোডা, ইত্যাদি আনতে হবে। ফাদার হ্যারিস ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে আসব।'

মিশন কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে ফাদার হ্যারিস ভাবতে লাগলেন, কোনদিকে যাবেন। যাবার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। লক্ষহীনের মতো তিনি সামনের দিকে সাইকেল চালাতে লাগলেন।

খানিকটা যাবার পরই বিকেলের রোদ মরে এল। আজ থেকেই পৌষ মাস পড়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এখন শীত। রাজানগরের বাড়িঘরের মাথায় লম্বা লম্বা পা ফেলে শীতের সন্ধ্যে নেমে আসছে।

সেই কবে রাজানগরে এসেছিলেন ফাদার হ্যারিস ; সে কি দু-চার বছরের কথা! এখানে আসার পর লোকজনের সঙ্গে শুধু আলাপ-পরিচয়ের অপেক্ষা। তারপরেই দেখা গিয়েছিল, সন্ধ্যে হতে না হতেই তিনি এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়াচ্ছেন। কাদের বাড়ির ছেলেটা অঙ্কে কাঁচা, কোন ছেলেটার মাথায় ইংলিশ গ্রামার একেবারেই ঢোকে না, ইতিহাস নিয়ে কে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—দেখা যেত, ফাদার হ্যারিস তাদের পড়া দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মিশনে ফিরতে ফিরতে একেক দিন অনেক রাত হয়ে যেত তাঁর।

হাসপাতালে যাবার আগেও তিনি এভাবে পড়িয়েছেন। তবে নিয়মিত পড়াতেন না। মধ্যে মধ্যে এক-আধদিন। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ; শরীরের শক্তি সামর্থ্য দিন দিন কমে আসছে তো।

যাই হোক, আজ প্রথমেই ফাদার হ্যারিস গেলেন মল্লিকদের বাড়ি। এ বাড়ির দুটো ছেলে টেন আর ইলেভেন ক্লাসে পড়ে। সব সাবজেক্টেই ছেলেদুটো ভীষণ কাঁচা। বছর বছর ফেল করে। বাপ-মা ফি বছরই স্কুলে হত্যে দিয়ে মাস্টার মশাইদের ধরাধরি করে দুই ছেলেকে পরের ক্লাসে তোলে।

খবর নিয়ে জানা গেল, দু জনের কেউ বাড়ি নেই। এ সময় ওরা নাকি কোনদিনই বাড়ি থাকে না। কোথায় গেছে, কখন ফিরবে, কেউ জানে না। তবে রাত দশটার আগে ফিরবে না, বাড়ির লোক এটুকু বলতে পারল।

মল্লিকদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরকার বাড়িতে এলেন ফাদার হ্যারিস। এ বাড়ির একটি ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। খবর পাওয়া গেল পড়া ছেড়ে এখন সে পার্টি টার্টি করছে। সরকার বাড়ির পর লাহাবাবুদের বাড়ি, তারপর একে একে রায়চৌধুরীদের বাড়ি, মুখার্জিদের বাড়ি, মিত্তিরদের বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। ঘোরাই সার। কোন ছেলেই বাড়িতে নেই। একমাত্র মিত্তিরদের বাড়িতে একটি ছেলেকে পাওয়া গেল।

তাকে ঘণ্টাখানেক প্রেসি করিয়ে রাস্তায় এসে ফাদার হ্যারিস ভাবলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মা সরস্বতী বোধ হয় বিদেয় নেবার জন্ম পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া এখানে আর হবে না। এই জেনারেসনটার জন্ম খুবই কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন তিনি। অথচ প্রথম যখন এখানে আসেন তখনকার কথাই বা কেন, পাঁচ-সাত বছর আগেও এ শহরে পড়াশোনার বেশ চর্চা ছিল। সন্ধ্যের সময় যে কোন বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে দেখা যেত ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। এখন রাত দশটার আগে কোন ছেলেই নাকি বাড়ি ঢোকে না।

অন্যমনস্কের মতো সাইকেল চালাতে চালাতে ফাদার হ্যারিস কখন যে বাজারপাড়ায় চলে এসেছিলেন খেয়াল নেই। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল 'রামধনু টকীজে'র ওধারে 'প্রভা কাফে'র সামনে পারিজাত দাঁড়িয়ে আছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে সট করে সে ভেতরে গেল; তারপর ডানদিকের শেষ প্রান্তে পর্দাঢাকা কেবিনটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ফাদার হ্যারিসের খুব ইচ্ছা হল, একটু মজা করেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাইকেলটা 'প্রভা কাফে'র গায়ে হেলান দিয়ে রেখে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

এখন, এই শীতের সন্ধ্যায় 'প্রভা কাফে'তে প্রচুর খদ্দের; চারদিকে থোকায় থোকায় তারা বসে আছে। বয়গুলো ব্যস্তভাবে কাপ-প্লেট-কাঁটা-চামচ নিয়ে ছোটাছুটি করছে। একধারে 'প্রভা কাফে'র মালিক সুরপতি সমাদ্দার কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় বসে হিসেব করে খদ্দেরদের বিলের টাকা পয়সা মিটিয়ে নিচ্ছে এবং চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। মধ্যবয়সী সুরপতির দুটো দাঁত সোনা-বাঁধানো, মাথার চুলে কলপ, পাঁচ নম্বর কড়াইর মতো প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি। ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা এই লোকটার গলায় সোনার মফচেন; দু-হাতে কম করে ছ'টা আংটি। পরনে ফিনফিনে ধুতি। সার্জের পাঞ্জাবি এবং নক্সাপাড়

কাশ্মীরি শাল। সুরপতি এক সময় রাজানগরের মার্কামারা গুণ্ডা ছিল। একবার ছুরি মেরে একটা লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিল; ধরা পড়ে তিনটি বছর তাকে জেল খাটতে হয়েছে। জেল থেকে বেরুবার পর ফাদার হ্যারিস তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই রেস্টুরেন্টটা খুলিয়েছিলেন। ক'বছর ধরে 'প্রভা কাফে' ভালই চলছে। সুরপতি বেশ দাঁড়িয়ে গেছে: এখন সে এ শহরের একজন ভদ্রলোক। জীবনের এই মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ফাদার হ্যারিসের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

ফাদার হ্যারিসকে দেখে সুরপতি ডাকল, 'আসুন বাবাসাহেব। অনেকদিন পর আমার এখানে এলেন।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আসব কি করে, আমি কি এখানে ছিলাম?' বলেই গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পারিজাতকে ঢুকতে দেখলাম না?'

পারিজাতের ব্যাপারটা সুরপতিও জানে। সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ। ওই কেবিনে আছে।'

'তিনিও এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রোজই ওরা আসে তো?'

'কোথায় আর যাবে—'

'দাঁড়া; ওদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।'

ডান দিকের সেই কেবিনটার কাছে এসেই ফাদার হ্যারিস বুঝতে পারলেন, পারিজাত আর সবিতা মুখোমুখি বসে আছে। পর্দা সরিয়ে বললেন, 'দুই আসামীই হাজির দেখছি।'

তাঁকে দেখেই দু'জনে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দারুণ খুশির গলায় বলল, 'আসুন ফাদার, আসুন।'

ফাদার হ্যারিস ওদের কাছে গিয়ে বসলেন। তারপর চোখের কোণ দিয়ে একবার সবিতা, আরেকবার পারিজাতের দিকে তাকিয়ে রগড়ের গলায় বললেন, 'তারপর, মেল ট্রেন কেমন চলছে?'

পারিজাত হাসতে হাসতে বলল, 'চলছে আর কই? একেবারে স্ট্যাণ্ড স্টীল; সামনের রেড সিগন্যাল আর গ্রীন হচ্ছে না।'

পারিজাতের বয়েস সাতাশ আটাশ; টগবগে জোয়ান ছেলে সে। এখানকারই একটা টিউটিরিয়ালে পড়ায়। সবিতার বয়েস তেইশ চব্বিশ; নাক মুখ কাটা-কাটা; লম্বা ছাঁদের সুশ্রী চেহারা। সে গানের টুইশানি করে। ক'বছর ধরে ত্বজনের প্রেম চলছে। সন্ধ্যে ছ'টার সময় 'প্রভা কাফে'তে চলে আসে ওরা। ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা, আধঘণ্টা বসে বসে গল্প করে চা-টা খায়। সুরপতি বেশ বিবেচক; এই সময়টা ডানদিকের ওই কেবিনে অন্য কোন খদ্দেরকে সে ঢুকতে গ্যায় না।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'হ্যাঁ রে, হিসেব করে বল্ তো, ক'বছর ধরে তোদের প্রেম চলছে। কারেক্ট হিসেব চাই—'

'পাঁচ বছর—' পারিজাত বলল।

'তার মানে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ব্যাপার। তা বিয়েটা করছিস?'

'আমি কি করে বলব?'

ফাদার হ্যারিস অবাক হাসল, 'তবে কে বলবে?'

'ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, আর বাহাত্তরটা প্রাইভেট কোম্পানি।'

ফাদার হ্যারিস বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'তার মানে?'

পারিজাত বলল, 'ভেরি সিম্পল। ওই সব জায়গায় চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেসন করেছি যে। ওদের কেউ যদি চাকরি দেয় তবেই তো বিয়েটা হবে। এখন আপনিই বলুন ফাদার আমাদের বিয়ের ডেটটা কাদের হাতে।'

ফাদার হ্যারিস জানেন, একটা চাকরির জন্য ওদের বিয়েটা আটকে আছে। তিনি কী বলবেন, ভেবে পেলেন না, বিমর্ষভাবে শুধু মাথা নাড়লেন।

পারিজাত বলল, 'পাঁচটা বছর কেটে গেছে। চাকরির আশায় থেকে থেকে আরো কত পাঁচ বছর কেটে যাবে, কে জানে। আমার কী মনে হয় জানেন ফাদার—'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কী ?'

'আমাদের কপালে বিয়ে-টিয়ে নেই।' পারিজাত বলতে লাগল, 'প্রভা কাফে'তে রোজ এই রকম আধঘণ্টার জন্য দেখা করব, একটু গল্প-সল্প, এক কাপ চা খাওয়া—এই করেই শালা লাইফ কেটে যাবে।'

ফাদার হ্যারিস তার কাঁধে একখানা হাত রেখে সহানুভূতির গলায় বললেন, 'এত ভেঙে পড়ছিস কেন ? একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

'যারা চাকরি-বাকরি দ্যায় তারা যদি আপনার মতো কনসিডারেট হত, ভাবনা ছিল না। সে যাক গে, অনেকদিন পর দেখা, কী খাবেন বলুন—'

'কিচ্ছু নয় আমি এখন উঠব।'

সবিতা বলল, 'তাই কখনো হয় ; এক কাপ চা—'

ফাদার হ্যারিস বলল, 'নাথিং ; অসুখ থেকে উঠেছি। যখন তখন খাওয়া বারণ।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করুন। কতদিন পর আপনাকে পেয়েছি।'

'নো ডিয়ার, নো—'

'কেন ?'

'তোদের হাতে তো মোটে আধঘণ্টা সময়, তাতে আর ভাগ বসাতে চাই না।'

সবিতার মুখ লজ্জায় ঈষৎ লাল হল। চোখ নামিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা—'

'তা ছাড়া—' এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন ফাদার হ্যারিস।

পারিজাত জিজ্ঞেস করল, 'তা ছাড়া কী ?'

'প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হাইফেনের মতো ঢুকে থাকতে নেই।' ফাদার হ্যারিস উঠে পড়লেন। সবিতার গালে আলতো টোকা দিয়ে, পারিজাতের ঝাঁকড়া মাকড়া চুল এলোমেলো করে পর্দা ঠেলে কেবিনের বাইরে যেতে যেতে বললেন, 'একদিন তোরা মিশনে আসিস।'

ওরা দু'জনে একসঙ্গে বলল, 'আসব।'

বাইরে বেরিয়ে সোজা সুরপতির কাছে চলে এলেন ফাদার হ্যারিস। বললেন, 'চলি রে—'

সুরপতি বলল, 'বাঃ, এসেই চলে যাচ্ছেন! এতদিন পর এলেন, একটু বসে যান।'

'না রে, আজ বসব না। রাত হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে দুর্গা বকুনি লাগাবে।'

'আপনার বৌমা আপনার কথা খুব বলছিল। অনেকদিন আমাদের বাড়ি যান না, সে খুব রেগে আছে।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'বৌমাকে বলে দিস, শিগগিরই একদিন যাব, তার হাতের মোচার ঘণ্ট আর সুক্তো খেয়ে আসব।'

সুরপতি বলল, 'পাক্কা বাত—'

'পাক্কা বাত।'

'প্রভা কাফে' থেকে বেরিয়ে ফাদার হ্যারিস আবার তাঁর সাইকেলে উঠলেন। আর তখনই মনে পড়ল, দুর্গা তাকে টুকিটাকি ক'টা জিনিস কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল।

একটু এগিয়েই বাঁ দিকে মল্লিকদের প্রকাণ্ড মুদি কাম মনিহারি দোকান—'হরেক রকম ভাণ্ডার'। ফাদার হ্যারিস সোজা সেখানে এসে সাইকেল থেকে নামলেন।

রোজ এই সময়টা হরেক রকম ভাণ্ডারে খদ্দেরদের ভিড় লেগে থাকে, আজও ছিল।

ফাদার হ্যারিসকে দেখে দোকানের মালিক মধ্যবয়সী রাধাগোবিন্দ মল্লিক ভেতরের কাউন্টার থেকে উঠে এল। সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'আসুন আসুন বাবাসাহেব, ভেতরে এসে বসুন—'

'না রে, আজ আর বসবার সময় নেই।' ফাদার হ্যারিস বলতে লাগলেন, 'আমার ক'টা জিনিসের দরকার। চট করে দিয়ে দে; পালাই—'

'পাঁচ মিনিট বসুন না—'

'এক মিনিটও না; মা দশভুজা ওদিকে খাঁড়ায় শান দিচ্ছে, দেরি করলে ঘাড়ে মাথা থাকবে না।'

দুর্গার ব্যাপারটা এ শহরের সবার জানা। তবু রাধাগোবিন্দ বলল, 'একটু বসে গেলে এমন কিছু দেরি হত না। শুনেছিলাম আপনার খুব অসুখ। কী হয়েছিল?'

'আরেকদিন এসে বলব। এখন এগুলো দে—' পেস্ট-সাবান-দাড়ি কামাবার ব্লেড—দুর্গা যা-যা নিতে বলেছিল গড় গড় করে তার তালিকা দিয়ে গেলেন ফাদার হ্যারিস।

জিনিসগুলো নিয়ে দাম মিটিয়ে বেরুতে যাবেন, সেই ছোকরাগুলো বল্টু, বিশে, গৌর, হাবলে ইত্যাদিরা হরেক রকম ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ল। সোজা রাধাগোবিন্দর দিকেই যাচ্ছিল তারা, হঠাৎ ফাদার হ্যারিসকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বল্টু বলল, 'এই যে ফাদার বাবা, কাল থেকে তোমাকে আমরা টেরিফিক খুঁজছি; পেয়ে গিয়ে ভালই হল। নইলে আবার শ্লা তিন মাইল ঠেঙিয়ে হাঁটুর কব্জা ঢিলে করে সেই মিশনে ছুটতে হত।'

ফাদার হ্যারিস হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার বল্টুচন্দ্র; আমাকে এত খোঁজাখুঁজি কেন?'

'তোমাকে সেদিন আমাদের একটা প্ল্যানের কথা বলেছিলাম না; মনে পড়ছে?'

'পড়ছে।'

'সেই প্ল্যানটা আমরা ঠিক করে ফেলেছি। সেটা বলবার জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম—'

'বলে ফেল—'

'তার আগে ওই দিকটা দেখ—' বল্টু রাস্তার ওধারে কোণাকুণি যেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সেদিকটায় 'রামধনু টকীজ'। সিনেমা হলটার ঠিক গায়েই অনেকগুলো বাঁশ পোঁতা হয়েছে, আরো অনেকগুলো স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, ওখানে একটা প্যাণ্ডেল তৈরি হবে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'একটা প্যাণ্ডেল হবে, মনে হচ্ছে।'

'ঠিক ধরেছ ফাদার বাবা। ওটা শ্লা বারোমাস পার্মানেণ্ট খাড়া থাকবে।'

ফাদার হ্যারিস হতবাক, 'পার্মানেণ্ট প্যাণ্ডেল; কি ব্যাপার রে?'

হাবলে বললে, 'এ মাসে আমরা ওখানে সার্ব্বোজনীন শেতলা পুজো করব। পনের দিন শেতলা পুজো চলবে। শেতলা পুজোর পর সরস্বতী পুজো এসে যাবে, সেটা চালাব থ্রী উইক—তিন সপ্তা। তারপর পাঁজী দেখে ঠিক করব, আর কী কী পুজো আছে। শ্লা যত পুজো আছে—কার্ত্তিক, গণেশ, মহাদেব, কালী, ঘণ্টাকন্ন সব্বার পুজো করব। এমন কি যমেরও—'

নেত্য বলল, 'আমরা শ্লা হিন্দু; সব মাসেই গাদা গাদা পুজোর লিস্তি আছে—'

বিশে বলল, 'যদি হাতের কাছে কিছু না পাই বড় দিন ফড়দিন লড়িয়ে দেব। যীশুখেষ্ট আর সেই বুড়ো স্টাণ্টাক্লস না কে যেন—সে তোমার কাছে পরে জেনে নেব; ওদের প্যাণ্ডেলে বসিয়ে দেব।'

বল্টু বলল, 'শেতলা পুজোটা কি টেরিফিক করি একবার দেখবে। কলকাতা থেকে মিনিস্টার এনে উদ্বোধন করবে; আর তুমি হবে মাইরি চীফ গেস্ট—প্রধান অতিথি।'

ফাদার হ্যারিস অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন, 'সারা বছর ধরে পুজো করবি! মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হাবলে সোজাসুজি তাঁর চোখের ভেতর তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছ না।'

'না।'

'আমরা শ্লা বেকার, চাকরি নেই বাকরি নেই। আগাছার মতো বেঁচে আছি। তাই বলে শ্লা সুইসাইড করে মরতে তো পারি না। বাবার ধরমশালা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কিছু ইনকাম দরকার। অনেক মাথা খাটিয়ে এই পুজোর বিজনেসটা বার করেছি—দেখবে শ্লা ক্যাণ্টার করে দেব।'

'পুজোর বিজনেস!'

'তাতে খারাপটা কী! কেউ ভেজালের বিজনেস করছে, কেউ স্মাগলিং-এর বিজনেস করছে, কেউ করছে পলিটিকসের বিজনেস। পুজোর বিজনেসটা ওগুলোর চাইতে কি বেশি খারাপ? যদ্দিন না কাজ পাচ্ছি, এটা চালিয়ে যাব।' বলতে বলতে আচমকা কি মনে পড়ে যেতে হাবলে বল্টুর দিকে ফিরল, 'এ্যাই শ্লা বল্টে, রাধাগোবিন্দদাকে বিলটা লড়িয়ে দে—'

বল্টু তাড়াতাড়ি হিপ পকেট থেকে বিল বই বার করে একখানা পাতা ছিঁড়ে রাধাগোবিন্দের হাতে দিল।

নাম এবং চাঁদার অঙ্ক আগেই লেখা ছিল। দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল রাধাগোবিন্দর।

বল্টু বলল, 'ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে রাধা-গোবিন্দদা—' বাঁ হাতের তর্জনীটা নাচাতে নাচাতে সে বলল, 'চাঁদাটা বার করে ফেল মাইরি—'

এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার মতো হুস করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল রাধাগোবিন্দর মুখ থেকে, 'পাঁচ শো এক টাকা চাঁদা!'

'তোমার কাছে পাঁচ শো এক টাকা আবার টাকা নাকি! চোখে

হেডলাইট জ্বালিয়ে না রেখে পাঁচখানা বড় পাত্তি বার করে ফেল দাদা ; আমাদের আরো জায়গায় যেতে হবে তো।'

'আমি ভাই অত দিতে পারব না।'

'এই ফার্স্ট বলে একটু বেশি নিচ্ছি ; বোঝোই তো প্যাণ্ডেলে-ফ্যাণ্ডেলে ইনভেস্ট করতে হবে। এর পর থেকে যে পুজোই হোক ফিফটি রুপিজের এক পয়সাও বেশি নেব না। বার কর, বার কর—'

'অত টাকা কোথায় পাব ? আমাকে মেরে ফেললেও দিতে পারব না।'

বল্টুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, 'অত টাকা কোথায় পাবে! মনে করেছ আমরা কিছুই জানি না! বেবি ফুডের তো কোটা আছে তোমার ; কন্ট্রোল রেটে ক'টা বিক্রি কর ? আর ব্ল্যাকে কতগুলো ঝাড়ো ?'

রাধাগোবিন্দকে হঠাৎ খুব নার্ভাস দেখাল ; তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

বল্টু তীব্র চাপা গলায় আবার বলল, 'ওই টাকাটা তুমি কেন, তোমার বাপ দেবে—'

ফাদার হ্যারিস এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'এই বল্টু, কি হচ্ছে! শেতলা পুজোয় পাঁচ শো টাকা চাঁদা নেবার কোন মানে হয় ?'

স্বপক্ষে একজনকে পেয়ে মিয়ানো গলায় রাধাগোবিন্দ বলল, 'দেখুন দিকি, কিরকম জুলুম—'

বল্টু এক পলক ফাদারের দিকে তাকাল। তারপর কি ভেবে রাধাগোবিন্দর হাত থেকে বিলটা নিয়ে পাঁচ শো টাকা কেটে দুশো টাকা বসাল। বলল, 'ঠিক আছে ফাদার যখন বলেছে তার ওপর তো কথা নেই ; ফাদার প্রেস্টিজে তিন শো কমিয়ে দিলাম—' ফাদার হ্যারিসকে বলল, 'তোমাকে মাইরি চীফ গেস্ট করব ; আর তুমি কিনা পয়লা চোটেই থ্রী হানড্রেড লস করিয়ে দিলে!'

ফাদার হাসলেন।

রাধাগোবিন্দ বলল, 'কিন্তু টাকাটা এক্ষুনি দেবার অসুবিধা আছে—'

'ঠিক আছে পরে প্যাণ্ডেলে পাঠিয়ে দিও।' বল্টুরা চলে গেল।

রাধাগোবিন্দ বলল, 'দেখলেন, বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হারামীগুলোর কারবারটা দেখলেন—'

ফাদার হ্যারিস উত্তর না দিয়ে পেস্ট সাবান টাবানের প্যাকেটটা নিয়ে সাইকেলে উঠে পড়েন। বল্টু, বিশে এবং তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলেন।

আট

মিশনে ফিরে ফাদার হ্যারিস দেখলেন, হীরেন এসেছে। তাঁর বিছানায় শুয়ে শুয়ে হীরেন সিগারেট টানছিল আর মুখ থেকে ধোঁয়ার আংটি বার করে হাওয়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তলায় বসে পিলে সমানে বকে যাচ্ছে ; তার বকবকানি হীরেনের কানে ঢুকছিল কিনা কে জানে। দুর্গা দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

দুর্গার হাতে সাবান-টাবানের প্যাকেটটা দিয়ে নিজের ঘরে এলেন ফাদার হ্যারিস। হীরেনকে দেখে তিনি খুব খুশী। বললেন, 'এ্যাংগ্রি ইয়াং ম্যান যে—'

ফাদারকে দেখে উঠে বসল হীরেন। সিগারেটটা ছোট হয়ে আসছিল ; এ্যাশ ট্রেতে সেটা রেখে বলল, 'এ্যাংগ্রি আর থাকতে দিলে কোথায় ? যেটুকু ফায়ার আমার মধ্যে ছিল তুমিই তো তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। আমি একটি নির্বাপিত, কী বলব—হাউই ?'

ভুরু টুরু কুঁচকে কৌতুকের চোখে হীরেনকে দেখতে লাগলেন ফাদার হ্যারিস। ওকে খুব পছন্দ করেন তিনি। ছেলেটা দারুণ তাজা আর টগবগে। সর্বক্ষণ সে যেন ফুটছে। এ্যাংগ্রি জেনারেশন বলতে যা বোঝায় ও তাদেরই একজন।

এই রাজানগরেরই ছেলে হীরেন। এখন অবশ্য এখানে থাকে না, কলকাতায় বেলগাছিয়ার কাছে মিডল ইনকাম গ্রুপের জন্য গভর্নমেন্ট যে সব ফ্ল্যাট তৈরি করেছে মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বছর দুই হল সেখানে চলে গেছে। ফাদার হ্যারিস অনেকবার ওদের ফ্ল্যাটে গেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই হীরেনকে চেনেন ফাদার হ্যারিস। এই মিশন স্কুলেই পড়ত। দুর্দান্ত ছাত্র ছিল কিন্তু কিছুতেই পড়ত না।

তবু রেজাল্টটা বরাবর বেশ ভালই করে গেছে। স্কুলে থাকতে দারুণ মারামারি করত, প্রায়ই অন্য ছেলেদের কাছ থেকে তার নামে গাদা গাদা কমপ্লেন আসত। হায়ার ক্লাসে পড়তে পড়তেই সিগারেট ধরেছিল। একদিন সিগারেট ধরিয়েই ফাদার ডগলাসের ক্লাসে ঢুকেছিল। স্বভাবতই ফাদার ডগলাসের রেগে যাবার কথা, তিনি প্রিন্সিপ্যালের কাছে রিপোর্টও করেছিলেন। সে যাত্রা ফাদার হ্যারিসই মধ্যস্থতা করে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

স্কুল থেকে যখন কলকাতার কলেজে হীরেন পড়তে গেল তখনও তার নামে অনেক কথা শোনা যেত।· প্রফেসরদের সে গ্রাহ্যই করত না, তাদের কাছ থেকে সিগারেট টিগারেট চেয়ে নিত। পকেট খালি থাকলে দশ বিশ টাকা তাঁদের কাছে ধারও করত। তারপর শোনা গেল, সে চুটিয়ে পলিটিকস করছে। প্রায়ই মিছিল বার করে, হাওয়ায় ঘুষি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্রুদ্ধ বক্তৃতা দেয়, কারণে অকারণে কলেজে স্ট্রাইক করায়। যখন সে তাদের পার্টিতে প্রায় তরুণ তুর্কী হয়ে উঠেছে, সেই সময় দলের লীডারদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি বাধিয়ে দুম করে রাজনীতি ছেড়ে দিল। তারপর একদিন শোনা গেল সে ভয়াবহ রকমের নেশা করছে। চরস, গাঁজা, তাড়ি, এল এস ডি থেকে শুরু করে পেথিডিন ইঞ্জেকসন পর্যন্ত। কিছুদিন সব ছেড়ে ছুড়ে বারুইপুরের কাছে হিপিদের ক্যাম্পে গিয়ে ছিল। আচমকা একদিন শোনা গেল, হিপি-সঙ্গ সে ত্যাগ করেছে এবং নেশা টেশাও আর করছে না। আবার শোনা গেল, হীরেন একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে; দিনরাত দু জনকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। হঠাৎ কে যেন খবর দিল, মেয়েটি প্রেগনান্ট; তার বাচ্চা-টাচ্চা হবে। এতদূর এগিয়েও হীরেন কিন্তু তাকে বিয়ে করেনি, বরং তাকে বলেছিল তাঁর সঙ্গে থাকতে। মেয়েটি এবং তার অভিভাবকরা বিয়ে করার জন্য হীরেনের ওপর চাপ দিচ্ছিল; সে কিন্তু রাজী হয় নি। সে বলেছিল ওই সব বিয়ে ফিয়ের মানে না, তবে মেয়েটিকে বাচ্চা সমেত এ্যাকসেপ্ট করতে

রাজী। মেয়ের পক্ষ থেকে বোঝানো হয়েছিল, তা কি করে সম্ভব, আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, সামাজিক নিয়মকানুন রয়েছে। সে সব অগ্রাহ্য করে একটি যুবক এবং একটি যুবতী কোন স্বীকৃতির ভিত্তিতে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে? হীরেন জানিয়েছিল, তা হলে তার কিছু করবার নেই। এক কথায় সে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল একটি নার্সিং হোমের কৃপায় সেই মেয়েটি সামাজিক লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছে।

মোট কথা কোন কিছুর প্রতিই তার মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। যা কিছু কোমল অথবা সুকুমার তা ছিঁড়েখুঁড়ে বিকৃত করে দিতে চাইত সে। পুরনো সমাজ ব্যবস্থা, নিয়ম কানুন, আচরণ বিধি, শৃঙ্খলাবোধ—সব কিছুর বিরুদ্ধে ছিল তার বিদ্বেষ, ঘৃণা আর তীব্র অসন্তোষ এবং রাগও। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জেনারেসন গ্যাপ কাকে বলে তা যেন অনেকটাই বুঝতে পারতেন ফাদার হ্যারিস।

মাঝে মাঝে হীরেনের বাবা—মার্চেন্ট অফিসের লেজার কীপার ছিল সে—আসত ফাদার হ্যারিসের কাছে। বিষণ্ণ মুখে বলত, 'হীরুকে একটু বোঝান বাবাসাহেব ওর ওপর কত আশা করেছিলাম—'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'বুঝিয়ে কিছু হবে না। ওর একটা ধাক্কা খাওয়া দরকার। একটু ধৈর্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এত সব কাণ্ড কারখানা সত্ত্বেও বি-এতে সে সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল মাত্র দু'জন।

ফাদার হ্যারিসের মনে আছে ইউনিভার্সিটির কনভোকেসনের দিন কিছুতেই গাউন পরে ডিগ্রি আনতে যাবে না হীরেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদিও বা পাঠানো হল কনভোকেসনে গিয়ে সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসল। ডিগ্রি যখন তার হাতে দেওয়া হচ্ছে হীরেন চিৎকার করে উঠেছিল, 'ডিগ্রী তো দিচ্ছেন, এতে চাকরির গ্যারান্টি আছে?'

যার হাত দিয়ে ডিগ্রি বিতরণ করা হচ্ছিল তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ, দেশজোড়া তাঁর নাম। ভদ্রলোক একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, কি উত্তর দিবেন বুঝতে পারছিলেন না।

হীরেন ডিগ্রীর কাগজটা মাথার ওপর তুলে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'চাকরি না পেলে এটা কি গলায় মাদুলি করে ঝুলিয়ে রাখব ?'

সমস্ত কনভোকেসন হল স্তব্ধ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবাই তাকিয়েছিল। এমন একটা জঘন্য অশোভন কাণ্ড ঘটতে পারে, কেউ যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছিল না।

হীরেন গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে আবার চিৎকার করছিল, 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই।' পেছন দিক থেকে এবার আরো অনেকে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে, 'ডিগ্রি চাই না, চাকরি চাই—'

হীরেন এরপর যা করেছিল তা প্রায় অভাবনীয়। আচমকা হাতের ডিগ্রিটা ছিড়ে কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে দিতে সে বাইরে বেড়িয়ে গিয়েছিল : দেখাদেখি আরো কিছু ছেলেমেয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল।

কনভোকেসনে ওই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আসার বছর খানেক পর হীরেনের লেজার-কীপার বাবা দুম করে মারা গেল। আর তখনই হীরেন বুঝল সময়ের বিরুদ্ধে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যত বিদ্বেষই তার থাক, একালের ক্রুদ্ধ যুবক বা এ্যাংগ্রি ইয়ং ম্যান হিসেবে তার ইমেজ পরিচিতদের মধ্যে যত তীব্রই হোক্ না, দুঃখী মা এবং তিনটে ছোট ভাইবোন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। হীরেন বিচলিত বোধ করল। ভাবল একটা কিছু করা দরকার। ফলে কিছুদিন চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করল হীরেন। ঘুরে ঘুরে সে যখন ক্লান্ত হতাশ, সেই সময় ফাদার হ্যারিস একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। হীরেন এলে তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'চাকরি বাকরি মিলবে না বৎস। আর তোমার যা মেজাজ, চাকরি টিকিয়েও রাখতে পারবে না। তাই বলছিলাম, এই টাকাটা দিয়ে বিজনেস লাগিয়ে দে—'

'কিসের বিজনেস ?'

'তা-ও আমি ভেবে রেখেছি। দু-একটা কোম্পানির সঙ্গে কথাও বলেছি। তুই ওখানে ওদের দরকার মতো জিনিস সাপ্লাই দিবি। সেভেন এইট পারসেণ্ট কমিশন থেকে যাবে। এই নে কোম্পানির ঠিকানাগুলো।'

টাকা আর তিন চারটে কোম্পানির ঠিকানা নিয়ে পরের দিনই সাপ্লাইয়ের কাজে লেগে গিয়েছিল হীরেন। প্রথমে রাজানগরের আশেপাশে ছোটখাটো কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তার কাজকারবার চলত। তিনি চার বছরে ক্যাপিটাল বাড়িয়ে এখন কলকাতার বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছে ; এবং কাজকর্মের সুবিধার জন্য রাজানগর থেকে ফ্ল্যাট নিয়ে তাকে কলকাতাতেই চলে যেতে হয়েছে।

—ফাদার হ্যারিস তাকিয়েই ছিলেন। জুতো মোজা খুলে হীরেনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'নির্বাপিত হাউই' ফাইন বলেছিস। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস ?

'কী ?' হীরেন জিজ্ঞেস করল।

'তোর ফায়ার নেভে নি। আগে যেখানে সেখানে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাচ্ছিলি ; এখন ফায়ারটা ভাল কাজে লাগছে—'

'বলছ ?'

'বলছি।'

একটু চুপ করে থেকে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এবার অনেক দিন পর তোকে দেখলাম।'

হীরেন বলল, 'নানা ঝামেলায় আছি ; আসতেই পারি না।'

তা কতক্ষণ এসেছিস ?

'ঘণ্টা দুই। এসে শুনলাম তুমি কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলে। আমি তো কিছুই জানি না। কী হয়েছিল তোমার ?'

যা হয়েছিল ফাদার সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন।

অসুখ সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তার পর হীরেন বলল, 'তোমার সম্বন্ধে

অনেক অভিযোগ আছে।'

'যথা—'

'দুর্গাদি আর পিলে বলছিল তুমি নাকি কোন কথাই শোন না। এতবড় অসুখ থেকে উঠেছ ; রেস্ট ফেস্ট নাকি কিছু নাও না। আগের মতই ঘুরে বেড়াও—'

'ধুস, ওরা বাড়িয়ে বলেছে। আগের মতো কখনও বেরুই নাকি! হেলথই পারমিট করে না।'

স্থির চোখে ফাদার হ্যারিসকে নিরীক্ষণ করতে করতে হীরেন বলল, 'দেখ ফাদার, টুক করে যদি চোখ বোঁজ, কোন শালা ফিরেও তাকাবে না। আগে শরীরটা ঠিক কর ; বিশ্বপ্রেমের কথা কিছুদিন ভুলে যাও। শেষের দিকে টেনে টেনে বলল, 'ফিলানথ্রপিস্ট!'

ফাদার হ্যারিস হেসে ফেললেন, 'আমার কথা থাক। তোর খবর বল—'

হীরেন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। ফাদার হ্যারিস তাঁকে সামনাসামনি সিগারেট খাবার অনুমতি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। হীরেন বলল, 'নতুন খবর আর কি, দারুণ কাজের চাপ—'

'কর্মবীর হয়ে উঠেছিস তা হলে।'

'কর্মবীর! দারুণ বলেছ তো।'

'তা হ্যাঁ রে, বাড়ির সব কেমন আছে?'

'ভাল।'

'ভাই দুটো পড়াশোনা করছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বোনটা?'

'এমনি ভালোই আছে। এবার বি-এ-পার্ট ওয়ান দেবে। কিন্তু মা ওর বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। ভালো ছেলেটেলের খোঁজ কোরো তো। দারুণ কিছু চাই না। ভদ্র হবে, মোটামুটি খাইয়ে পরিয়ে রাখতে পারবে—এই রকম ছেলে হলেই চলবে।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আচ্ছা দেখব—'

আচমকা কি মনে পড়ে যেতে হীরেন প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'ওই দেখ, যে জন্যে এখানে আসা তাই বলতে ভুলে গেছি—'

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

হীরেন বলতে লাগল, 'তোমার টাকা এনেছি—'

'কিসের টাকা ?'

'বা রে, সাপ্লাইয়ের কারবারে নামবার সময় তুমি সেই যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলে। এই নাও—'টেবলের ওপর একটা পোর্ট ফোলিও ব্যাগ পড়েছিল। সেটা খুলে এক তাড়া এক শো টাকার নোট বার করে ফাদার হ্যারিসের হাতে দিল হীরেন। আবার বলল, 'এই নাও এক হাজার। এরপর থেকে এভরি উইকে এক হাজার এক হাজার করে পাবে। আমি প্রত্যেক রবিবার আসব। যাক বাবা, এ্যাদ্দিনে তোমার ঋণের খানিকটা অন্তত শোধ করতে পারলাম। বলতে বলতে আচমকা তাঁর কণ্ঠস্বর গভীরে নামল, আই অ্যাম সরি ফাদার—আমি একটা ফাস্ট ক্লাস গাধা—'

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল রে ?'

গাঢ় গলায় হীরেন বলল, 'তোমার ঋণ কখনও শোধ করা যায় !'

তার চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে ফাদার হ্যারিস স্নিগ্ধ হাসলেন, 'পাগলা !'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় হীরেন বলল, 'আজ কিন্তু আমি কলকাতায় ফিরছি না ফাদার, তোমার কাছে থাকব।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এত রাত্তিরে তোকে ফিরতে দিচ্ছে কে ? একটু বোস, দুর্গাকে তোর জন্যে চাট্টি চাল নিতে বলে আসি।'

'তোমার আর বলতে হবে না, আমি এসেই দুর্গাদিকে বলে দিয়েছি।'

'ভেরি গুড। অনেকদিন পর তোকে পেয়েছি। গল্প করে করে রাত কাটিয়ে দেব।'

'তুমি রাত জাগো, আর দুর্গাদির হাতে আমার প্রাণটা যাক। এগারোটার পর এক সেকেণ্ডও জেগে থাকতে পারবে না। এই কণ্ডিসানে আমি থাকব ; নইলে এক্ষুনি সি, ইউ, টি—কাট ; কেটে পড়ছি।'

করুণ মুখে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'এগারোটা না প্লীজ বারোটা। তুই দুর্গাকে একটু ম্যানেজ করিস।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে হীরেন বলল, 'তোমার এই প্রস্তাব কনসিডার করা যেতে পারে।'

এই সময় বাইরে শ্যামের গলা শোনা গেল, 'ফাদার আছ, ফাদার—' বলতে বলতে ঝড়ের বেগে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার চোখমুখ লাল, রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল শ্যামকে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। প্রায় হাঁপাচ্ছিল সে।

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার শ্যাম ?'

'গড়বড়ে ব্যাপার। ওই শ্লা লেলো আর তার পার্টি শিবানীদিদের বাড়ি ঝামেলা করছে। একটু আগে ও পাড়ায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে গিয়েছিলাম। শিবানীদি তোমাকে এক্ষুনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলল। আমি শ্লা ফিফটি মাইল স্পীডে রিক্সা উড়িয়ে নিয়ে এসেছি। চল, কুইক—'

ফাদার হ্যারিস বিচলিত বোধ করলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, সেদিন পাঞ্জা কষার পর লেলো সাবধান হয়ে গেছে, শিবানীদের পেছনে আর লাগবে না। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। মুখ থমথম করছে ; ঠোঁট শক্তবদ্ধ, ছুরি দিয়ে আঁচড় কাটার মতো কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটে বেরিয়েছে। তিনি বললেন, 'চল শ্যাম—'

হীরেন নিঃশব্দে ফাদার হ্যারিসকে লক্ষ্য করছিল। এবার বলল, 'শিবানী কে ?'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'নকুল সাধুখাঁর মেয়ে।'

'আরে ওকে তো, চিনি। রামধনু টকীজের পেছন দিকটায় থাকে না?'

'হ্যাঁ।'

'লেলো না কে যেন, সে ওর পেছনে লেগেছে কেন?'

কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন ফাদার হ্যারিস।

হীরেন বলল, 'নকুল সাধুখাঁ মারা গেছে নাকি? জানতাম না তো। জানবই বা কি করে। বছর তিনেক ধরে তো রাজানগরের সঙ্গে সম্পর্কই নেই।' বলতে বলতে থামল হীরেন। তারপর একটু ভেবে আবার বলল, 'বাপ নেই, এই সুযোগে ব্যাস্টার্ডগুলো বুঝি মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।' ফাদার হ্যারিস বললেন, 'তুই পিলের সঙ্গে একটু গল্প কর আমি ঘুরে আসছি।'

হীরেন বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব—'

'যাবি; আচ্ছা চল্—'

মিনিট দশেকের মধ্যে দেখা গেল, শ্যামের রিক্সায় করে ফাদার হ্যারিস আর হীরেন শিবানীদের বাড়ির সামনে এসে নামল। শ্যামের ডাকাডাকিতে দরজা খুলেই ফাদার হ্যারিসকে দেখে কেঁদে ফেলল শিবানী, 'আমি আর পারছি না ফাদার—'

তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে ভেতরে গিয়ে ফাদার দেখলেন, শিবানীর বোন উমা আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখেমুখে ভয়, আতঙ্ক।

বারান্দার হেরিকেন জ্বলছিল। তার আলোয় দেখা গেল, এধারে ওধারে দু তিনটে হাতল-ভাঙা চেয়ার পড়ে রয়েছে। ফাদার হ্যারিস একটা চেয়ারে বসলেন; হীরেন অন্য একটা চেয়ারে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'লেলো কী বলছে ?'

শিবানী বলল, 'নতুন আর কি বলবে। আগে মাঝে মধ্যে আসত ; এখন রোজ সাতবার আটবার করে আসছে। কতগুলো নোংরা চিঠি লিখেছে। এসব তো চলছেই। কিন্তু কাল রাত্তিরে যা করেছে—'

উদ্বেগের গলায় ফাদার হ্যারিস বললেন, 'কি করেছে ?'

'আমাদের তো টালির চালের ঘর। রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে উমা আর আমি শুই। আপনি অন্ধকারে বেরুতে বারণ করেছিলেন, আমরা সারারাত দরজা খুলি না। কিন্তু কাল মাঝরাতে চালের ওপর জোরে জোরে আওয়াজ হতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। প্রথমটা বুঝতে পারি নি তার পরেই মনে হল কেউ টালি ভাঙছে। তক্ষুনি ভাবলাম, লেলো নয় তো! ভয়ে উমা আর আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। লেলো চাল থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।'

শিবানী একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, 'ও একদিন সর্বনাশ করে ফেলবে ফাদার।'

ফাদার হ্যারিসকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

শিবানী থামে নি, 'আরেকটা ব্যাপারে আমি খুবই ভয় পেয়ে গেছি ফাদার—'

'কী ?'

'কাল এত চেঁচিয়েছি কিন্তু পাড়ার কেউ আসে নি। শুধু কালই না, লেলো যখন উৎপাত করে, পেছনে লাগে, দেখেও কেউ আসে না। আমরা কি শেষ হয়ে যাব ফাদার ?'

শিবানার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আজকের রাতটা সাবধানে কাটিয়ে দে। কাল আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।'

শ্যাম কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ বলল, অবিনাশ

চাটুজ্জের কাছে ভিড়বার পর লেলো মাকড়ার রেলা বেড়ে গেছে।'

ফাদার হ্যারিস ভেবে রেখেছেন কালই একবার অবিনাশের কাছে যাবেন। কথাটা অবশ্য বললেন না। আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে শিবানীদের প্রচুর সাহস দিয়ে এক সময় হীরেনকে নিয়ে উঠে পড়লেন।

নয়

পরের দিন ভোরবেলা উঠেই হীরেন কলকাতায় চলে গেল। যাবার আগে বলল, 'শিবানীকে নিয়ে তুমি খুব ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলে দেখছি।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'না, ঝঞ্ঝাট আর কি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'লেলোটা তো শুনলাম একটা রাফায়েন, গুণ্ডা। যা করবে ট্যাক্টফুলি, সময়টা খুব খারাপ—'

'তুই ভাবিস না ; ট্যাক্টফুলিই ম্যানেজ করে নেব।'

হীরেন চলে যাবার পর ফাদার হ্যারিস টুকটুকিদের বাড়ির দরজা থেকে তাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে বেড়াতে চলে গেলেন। ঘণ্টা-খানেক পর ফিরে এসে স্নান-টান সেরে চা খেয়ে আবার বেড়িয়ে পড়লেন। আজ আর তিনি লিখবেন না, দুর্গা আবছাভাবে কিছু একটা আন্দাজ করেছিল, সে বাধা দিল না।

মেরুদণ্ডের মতো সেই সোজা চওড়া রাস্তাটা দিয়ে ফাদার হ্যারিস দ্রুত সাইকেল চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজার পাড়ার জমজমাট অংশের শেষ প্রান্তে যেখানে এসে থামলেন সেটা একটা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। নিচের তলায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে লেখা আছে— 'রাজানগর ট্রেডিং কোম্পানি।' বাড়িটার দুধারে অনেকগুলো বড় বড় গো-ডাউন। ফাদার হ্যারিস জানেন ওগুলোও রাজানগর ট্রেডিং কোম্পানিরই। ওর ভেতর না পাওয়া যাবে হেন বস্তু নেই। ডাল, তেল, মশলা, কেরোসিন, সিমেন্ট, হার্ডওয়ার, প্লাম্বিং এবং এ্যালুমিনিয়মের নানারকম জিনিসপত্র। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুই ওখানে জমা করা আছে। অনেকের ধারণা এই সব জিনিসের বেশীর

ভাগই চোরাই মাল কিংবা স্মাগল করা। বর্ডার এখান থেকে খুব বেশি দূরে না ; ওধার থেকে নানারকম যোগসাজসে 'ফরেন গুডস'ও আসে। দিনের বেলা হয়তো দেখা যায়, গোডাউনগুলো বোঝাই। সকালবেলা ভানুমতীর খেলের মত দেখা গেল, একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

এই 'রাজানগর ট্রেডিং কোম্পানির' একমেব অধিপতি সেই অবিনাশ চ্যাটার্জি একদা ফাদার হ্যারিসেরই ছাত্র ছিল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে মিশন স্কুলে সে পড়ত। ছাত্র হিসেবে মোটামুটি ভালই ছিল অবিনাশ। তবে স্কুল ছাড়বার পর আর পড়াশোনা করেনি, সোজা বাবার ব্যবসাতে গিয়ে বসেছিল।

অবিনাশের বাবা উপেন চাটুজ্জের ছিল ছোটখাটো এজেন্সির ব্যবসা। কলকাতার বড় বড় কোম্পানির কাছ থেকে প্লাম্বিং আর স্যানিটারি ফিটিংসএর নানারকম জিনিস এনে অল্প কমিশনে বিক্রি করত। ব্যবসার দিকে বিশেষ মতিগতি ছিল না উপেন চাটুজ্জের। সে ছিল আমুদে হুল্লোড়বাজ লোক ; বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিতে আর তাস-পাশা খেলতে ভালবাসত। নেহাত যেটুকু না করলে সংসার একেবারে অচল হয়ে যায় সেইটুকু শুধু করত।

স্বভাবের দিক থেকে অবিনাশ ছিল উপেন চাটুজ্জের বিপরীত। কাজ ছাড়া সে প্রায় কিছুই বোঝে না। নানা ফন্দি ফিকির করে ক'বছরের মধ্যেই পৈতৃক ব্যবসার ভোল পাল্টে দিয়েছে।

ফাদার হ্যারিসের মনে আছে, অবিনাশ ব্যবসাতে ঢুকবার ছ'বছর পর উপেন চাটুজ্জে মারা যায়। উপেন ছিল বিপত্নীক, ছেলেপুলেও আর ছিল না। বাবার মৃত্যুর দু বছর পর বিয়ে করেছিল অবিনাশ।

তারপর দেখতে দেখতে চোখের সামনে অবিনাশের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। বাজারপাড়ার এই জমজমাট অংশে দুখানা তিনতলা বাড়ি তুলেছে সে ; সাত আটটা গো-ডাউন করেছে।

সামনের দিকের বাড়িটায় তার অফিস ; ব্যবসাসংক্রান্ত নানারকম কাজকর্ম এখানে হয়ে থাকে। পেছন দিকের বাড়িটায় সে বাস করে। ছোট্ট সংসার অবিনাশের। স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে আর সে নিজে।

ফাদার হ্যারিস শুনেছেন, বাইরের দিকে যেটুকু দেখা যায় সেটুকুই নয় ; অবিনাশের ব্যবসার শেকড় অন্ধকারে বহুদূর পর্যন্ত নাকি ছড়িয়ে আছে। স্মাগলার, ওয়াগান ব্রেকার এবং উঁচু তলার অনেক লোকের সঙ্গে নাকি তার গভীর যোগাযোগ। এই যোগাযোগের কল্যাণেই নাকি তাঁর ব্যবসা এত বড় হয়েছে। শোনা যায়, মরসুমের সময় অবিনাশ চাল ডাল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস হোর্ড করে, তারপর বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে চড়া দামে সে সব ছাড়ে। এ নিয়ে রাজানগরে এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে তার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ।

অবিনাশের ভেতরে যাই থাক, বাইরে সে কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী। ফাদার হ্যারিসের সঙ্গে যখন যে অবস্থাতেই দেখা হোক না, পায়ে হাত দিয়ে সে প্রণাম করে ; কখনও কখনও জোর করে বাড়ি ধরে এনে কাছে বসিয়ে এটা ওটা খাওয়ায় ; বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করে। এই সময় অবিনাশের আচরণ, কথাবার্তা খুবই আন্তরিক মনে হয়।

এখন প্রায় দশটার মত বাজে। রাজানগর ট্রেডিং-এর অফিস খুলে গেছে। দরজার সামনে নেপালী দরোয়ান কাঁধে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফাদার হ্যারিস সাইকেলটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে কাছে আসতেই দরোয়ান লম্বা স্যালুট ঠুকল, 'ক্যায়সা হ্যায় বাবাছায়েব ?'

হ্যারিস স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'ভালো' খুব ভালো। তুই কেমন আছিস ?'

'বহুত আচ্ছা।'

আদরের ভঙ্গিতে তার গালে টোকা দিয়ে ফাদার হ্যারিস ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই বাঁ দিকে ভিজিটরদের বসবার জন্য চেয়ার টেবলের ব্যবস্থা। ডানধারে কেরানী টাইপিস্ট এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বসবার জায়গা। তারপর লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ক্যাশ কাউন্টার। তার ওধারে সুদৃশ্য প্লাইউড দিয়ে ঘেরা অবিনাশের চেম্বার।

ফাদার হ্যারিস কম করে কয়েক শো বার এখানে এসেছেন। এখানকার সব কিছুই তাঁর মুখস্থ।

এখনও কাজকর্ম আরম্ভ হয় নি। সবে দু-একটি করে কর্মচারী আসতে শুরু করেছে। ফাদার হ্যারিস সোজা অবিনাশের চেয়ারে গিয়ে উঁকি দিলেন। চেম্বার ফাঁকা ; অবিনাশ এখনও আসে নি।

এরপর কী করতে হবে ফাদার হ্যারিসের জানা আছে। তিনি আর দাঁড়ালেন না। সোজা এগিয়ে গিয়ে ওধারের দরজা দিয়ে একটা ফুলবাগানে এসে পড়লেন। বাগান পেরুলেই আরেকটা তিনতলা বাড়ি।

দু মিনিটের মধ্যে ফাদার হ্যারিস ওই বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলেন। আর উঠবার মুখেই অবিনাশের বউ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চওড়া বারান্দা দিয়ে খুব ব্যস্তভাবে ওদিকের রান্নাঘরে যাচ্ছিল, ফাদারকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে বলল, 'আজ কোন দিকে সূর্য উঠেছে? পশ্চিমে?'

সস্নেহে হাসলেন ফাদার হ্যারিস, 'কেন রে মেয়ে?'

'পশ্চিমে না উঠলে কি আপনার দেখা পাওয়া যেত? আমাদের বাড়ির রাস্তা তো আজকাল ভুলেই গেছেন।' বলতে বলতে এক দৌড়ে কাছে এসে ফাদার হ্যারিসের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সরস্বতীকে দু হাতে তুলে ফাদার হ্যারিস বললেন, কেন এতদিন তিনি আসতে পারেন নি।

গোলগাল আদুরে ধরনের মেয়ে সরস্বতী। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, প্রচুর চুল, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, চওড়া সিঁথিও লাল

ডগডগে। প্রচুর হাসতে পারে মেয়েটা ; চোখে-মুখে কথা বলে। চোখ পাকিয়ে সে বলল, 'আমার কথার ওই উত্তর হল ? হাসপাতাল থেকে ফিরেই আসেননি কেন ?'

কপট ভয়ের গলায় ফাদার হ্যারিস বললেন, 'আসব আসব ভাবছিলাম—'

'আসব আসব ভাবছিলাম—' সুর করে ফাদার হ্যারিসের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করল সরস্বতী। তারপর বলল, 'মিথ্যে কথা।'

'না রে, না। সংসার নিয়ে এমন জড়িয়ে আছি যে কি বলব—'

'আপনার আবার কিসের সংসার! সাধু সন্ন্যাসী মানুষ!'

'আমার মত ঘোর সংসারী কে আছে বল। সারা রাজানগর জুড়েই তো আমার সংসার।'

'খুব হয়েছে। কথায় পারবার জো নেই। আসুন আমার সঙ্গে—'

সরস্বতী ফাদার হ্যারিসের একটা হাত ধরে এবার টানতে টানতে রান্নাঘরের সামনে এনে একটা মোড়ায় বসিয়ে দিল।

এ বাড়িতে ঠাকুর-চাকর সবই আছে। তবু সরস্বতী নিজের হাতে রান্না করে ছেলেমেয়ে এবং স্বামীকে না খাওয়াতে পারলে তৃপ্তি পায় না। মেয়েরা রান্নাবান্না করে খাওয়াবে—এই ব্যাপারটা ফাদার হ্যারিসের খুব ভাল লাগে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ছেলেমেয়েদের দেখছি না ; তারা কোথায় ?'

সরস্বতী রান্নাঘরে ঢুকে গিয়েছিল। সেখান থেকে বলল, 'স্কুলে গেছে।'

'আর তোর কর্তাটি ?'

'কে জানে ; সকালবেলা উঠেই তো বেরুল। দিন-রাত কি যে এত কাজ—'

'কখন ফিরবে, কিছু বলে গেছে ?'

'তাই কখনো বলে যায়। এক্ষুনি হুট করে ফিরে আসতে পারে।

আবার এবেলা হয়তো এলই না। যাওয়া-আসার কিচ্ছু ঠিক নেই। কতদিন যে ওর আশায় বসে থেকে আমার খাওয়া হয় না।'

ফাদার হ্যারিস যখনই আসেন, অবিনাশ সম্পর্কে এই অভিযোগ শুনতে হয়। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হ্যাঁ রে, আজ কি রাঁধলি?'

'সবে তো রান্না চড়ালাম। শুধু লাউপাতা-বড়িটড়ি দিয়ে নিরামিষ একটা ঝোল নেমেছে আর আলু ভাজা, কুচো বড়ি ভাজা আর মাছ ভাজা—এই তো। এতেই কত বেলা হয়ে গেল।'

'আমাকে একটু লাউপাতার ঝোল দে তো; চেখে দেখি—'

প্লেটে করে লাউপাতার তরকারিই না, মাছ ভাজা-টাজাও দিল সরস্বতী। তারপর চা করতে বসে গেল।

খেতে খেতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'দিনরাত অবিনাশের কি এত কাজ?'

সরস্বতী বলল, 'কি জানি!' তারপর একটু থেমে চিন্তাগ্রস্তের মত আবার বলল, 'সব সময় শুধু টাকার পেছনে ঘুরছে। আমার খুব ভয় করে ফাদার—'

'কেন রে?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় ও যে এত টাকা পয়সা করছে, সেগুলো সোজা রাস্তায় আসেনি। জানেন, ওর ওপর চারপাশের লোকের খুব রাগ। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ফাদার, বলবেন আমাদের এত টাকার দরকার নেই।'

'তুই বোঝাতে পারিস না?'

'আমার কথা কি শোনে।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যে অবিনাশ এসে পড়ল। তার বয়েস তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ। ছ'ফুটের মত লম্বা, রঙ কালো, তবে চোখ-মুখ বেশ আকর্ষণীয়, ঠোঁটে পাতলা গোঁফ। ক'বছর আগেও বেশ ছিপ-ছিপে ছিল অবিনাশ, এখন মোটা হয়ে গেছে; চোখের তলাটা ফুলো

ফুলো ; ঘাড়ে-গালে এবং পেটে প্রচুর চর্বি জমেছে। ফাদার হ্যারিস জানেন এই চর্বি অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত।

অবিনাশ রীতিমত শৌখিন। পরনে নকশাপাড় তাঁতের ধুতি, গরম পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী শাল। পায়ে চকচকে পাম্প শু। সোনার বোতাম, হীরের আংটি, সুদৃশ্য ঘড়ি। তাছাড়া গা থেকে ভুর ভুর করে দামী সেন্টের গন্ধ আসছে।

ফাদার হ্যারিসকে দেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল অবিনাশ। তারপর তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প্রণাম করে পায়ের কাছেই মেঝের ওপর বসে পড়ল।

ফাদার হ্যারিস ব্যস্তভাবে বললেন, 'ও কি ধুলোতে বসলি কেন?'

'ঠিক আছে। অবিনাশ বলতে লাগল, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ফাদার—'

'অনেকক্ষণ।'

আমি খবর পেয়েছি আপনি হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। এর মধ্যে একদিন যাবও ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা কাজে এমন আটকে গেলাম—'বলতে বলতে অবিনাশ সরস্বতীর দিকে ফিরল, ফাদার এখানে খেয়ে যাবেন বুঝলে—'

সরস্বতী কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফাদার হ্যারিস বলে উঠলেন, 'না রে, আজ না। আরেক দিন এসে খাব।'

অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, 'আজ নয় কেন?'

'আজ একটু কাজ আছে। তোকে বলতে হবে না, সময় করে একদিন এসে সরস্বতীর হাতে খেয়ে যাব।'

একটু চুপচাপ। তারপর ফাদার হ্যারিস বললেন, 'তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে অবিনাশ—'

'আপনার সঙ্গেও আমার খুব দরকার।'

'তোর দরকারটা পরে শুনছি। আগে আমার কথাটা শোন—'

'বলুন—'

'লেলোকে চিনিস তো?'

অবিনাশের চোখ পলকের জন্য প্রখর হয়ে উঠল। সতর্কভাবে সে বলল, 'চিনি।'

ফাদার হ্যারিস বললেন, নকুল সাধুখাঁ মারা যাবার পর লেলো তার মেয়েদুটোর পেছনে খুব লেগেছে। শুনলাম লেলো তোর কথা খুব শোনে। তুই একটু বলে দিস, ও যেন আর উৎপাত না করে। বাপ-মরা অসহায় মেয়ে—'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না অবিনাশ। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে বলে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নকুল সাধুখাঁর মেয়েদের ও আর ডিসটার্ব করবে না।'

'বাঁচালি বাবা, এবার তোর দরকারের কথাটা বল—'

'আজ না। শিগগিরই একদিন মিশনে যাব। সেদিন বলব।'

'কবে যাবি?'

একটু ভেবে অবিনাশ বলল, 'নেক্সট উইকে, মঙ্গল বুধবার যাব।'

চা হয়ে গিয়েছিল। সরস্বতী একটা কাপ স্বামীকে দিল, অন্যটা ফাদারকে।

চা খেতে খেতে ফাদার হ্যারিস বললেন, 'হ্যাঁ রে অবিনাশ, তোর নামে সরস্বতী কিন্তু নালিশ করছিল।'

অবিনাশ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

ফাদার হ্যারিস থামেননি, 'ও তোকে কাছে পায় না, সারাদিন নাকি টাকার পেছনে ঘুরে বেড়াস। অনেক তো করেছিস, আর টাকা দিয়ে কি হবে!'

অবিনাশ উত্তর দিল না, মুখ নামিয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

ফাদার হ্যারিস বললেন, 'ঘাড় চুলকুনিতে আমি ভুলছি না। এখন থেকে সরস্বতী যেভাবে চলতে বলে সেভাবে চলবি, বুঝলি?'

অস্পষ্টভাবে কিছু একটা বলল অবিনাশ, বোঝা গেল না।

একটু পর ফাদার হ্যারিস উঠে পড়লেন। ভেতরের বাড়ি, ফুল-

বাগান এবং সামনের দিকের অফিসবাড়ি পিছনে ফেলে বাইরের রাস্তায় বেরুতে যাবেন; কালীকিশোর কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেদিন ঝিলের পারে বেড়াতে যাবার সময় মেয়েপাড়ার কাছে সেই যে দেখা হয়েছিল, তারপর আজ আবার দেখা। আজ অবশ্য সুস্থই আছে সে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, কালীকিশোর যে, অবিনাশের কাছে নাকি ?

কালীকিশোর ঘাড় কাত করল, হ্যাঁ। অবিনাশকে একটু মবিল করতে এলাম কারণ কনটাক্টরি করে খাই ত। অবিনাশ ক'দিন পর রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটি দখল করছে। মোবিল লাগিয়ে ওকে হাতে রাখা দরকার। কনট্রাক্ট তো বাগাতে হবে। নাকি বলেন ফাদার—বলতে বলতে কালীকিশোর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফাদার হ্যারিস কয়েক পলক বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে অবিনাশের সম্পর্ক কিভাবে সেটা সে দখল করবে, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একসময় দেয়ালের গা থেকে সাইকেলটা নিয়ে উঠে পড়লেন। আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল উল্টোদিক থেকে সেই ছেলে তিনটে—রজত, অতীন আর নির্মল আসছে। তাঁকে দেখেই ওরা হকচকিয়ে গেল। তারপর সেদিনকার মতই প্রকাণ্ড ঝটকায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এক দৌড়ে রাজানগর ট্রেডিং কোম্পানির অফিসে ঢুকে পড়ল।

এইসব লোকের সঙ্গে অবিনাশের যোগাযোগ আছে—এ খবর আগেই জানতেন ফাদার হ্যারিস। সাইকেলটা চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন তিনি।

দশ

অবিনাশ কথা দিয়েছে ঠিকই তবু ফাদার হ্যারিসের দুর্ভাবনা পুরোপুরি কাটেনি। দিনে তিন চার বার করে বাজারপাড়ার পিছন দিকে এসে শিবানীদের খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। শিবানীরা এবার যা বলেছে তাতে ক্রমশ তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। লেলোরা নাকি আর উৎপাত করছে না, রাস্তায় দেখা হলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ফাদার হ্যারিস নিজেও লক্ষ্য করেছেন, ক্বচিৎ কখনো তাঁর মুখোমুখি পড়ে গেলে লেলো কোথায় পালাবে ভেবে পায় না।

ফাদার হ্যারিস শিবানীদের সম্পর্কে যখন দুশ্চিন্তা-মুক্ত; ঠিক সেই সময় একদিন সকালে অবিনাশ মিশনে এসে হাজির, সঙ্গে আরো চারটে লোক। অবিনাশের সঙ্গীদের চেনেন হ্যারিস। ওদের একজন ব্রজেন নন্দী এখানকারই একটা প্রাইমারি স্কুলের টীচার। আরেক জনের নাম রাখাল চট্টরাজ—নির্দিষ্ট কোন জীবিকা নেই, নানা ধরনের দালালি করে দু-চার পয়সা রোজগার করে। তৃতীয় লোকটির নাম নটবর সরখেল, বাজারে গ্যারেজ আছে তার। চতুর্থ জনের নাম প্রিয়গোপাল সামন্ত, এই লোকটিও চাকরি-বাকরি কিংবা ব্যবসা-পত্তর কিছুই করেন না। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালায়। চারজনই মধ্যবয়সী, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতরে ওদের বয়স।

ফাদার হ্যারিস সকালবেলা বেরিয়ে এসে সবেমাত্র লিখতে বসেছেন। ওদের দেখে কলম বন্ধ করে বললেন, আয় আয়—

অবিনাশ এগিয়ে এসে ফাদারকে প্রণাম করল। দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও।

ফাদার হ্যারিস বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই বয়েজ। বস, ওই তক্তপোষটার ওপর বসে পড়—

বসতে বসতে অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, লেলোটা আর ঝঞ্ঝাট করছে না তো ?

ফাদার হ্যারিস বললেন, না না, ও একেবারে গুড বয় হয়ে গেছে। মেয়ে দুটোকে তুই বাঁচিয়েছিস অবিনাশ। আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ।

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বিব্রতভাবে অবিনাশ বলল, এ আপনি কি বলছেন ! আপনি আমার গুরুজন, ওটা আদেশ দিয়েছিলেন, আমি তা পালন করেছি। কৃতজ্ঞতার কথা বললে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না।

ফাদার হ্যারিস হেসে বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন কি খাবি বল—

অবিনাশ বললেন, যা খাওয়াবেন তাই খাব।

ফাদার হ্যারিস দুর্গাকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দেখা গেল দুর্গা প্লেটে লুচি, আলুর তরকারি, বেগুনভাজা, সন্দেশ আর চা নিয়ে এ ঘরে ঢুকে পড়েছে।

খেতে খেতে এলোমেলো নানারকম গল্প হতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় অবিনাশ বলল, ফাদার, সেদিন আপনাকে একটা দরকারের কথা বলেছিলাম ; মনে আছে ?

ফাদার হ্যারিস মজা করে বললেন, নিশ্চয়ই আছে। বলে ফেল।

একটু চুপ করে থাকল অবিনাশ। সম্ভবত বক্তব্যটাকে মনে মনে গুছিয়ে নিতে লাগল। তারপর বলল, একটা ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আপনি না বলতে পারবেন না।

ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করলেন ফাদার হ্যারিস। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। 'হেসে হেসে বললেন আগে ব্যাপারটা শুনি। তারপর তো সাহায্যের কথা—

মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান আসছে, জানেন তো?

জানি; মার্চ মাসে।

এই ইলেকশানে আমরা কন্টেস্ট করব।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ফাদার হ্যারিস। ব্যবসা-ট্যবসা স্মাগলিং, কালোবাজারি, হোর্ডিং ইত্যাদি নিয়ে এতকাল ডুবে ছিল অবিনাশ। হঠাৎ সে ইলেকশান সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে শুরু করবে, এটা ভাবতে পারা যায় নি। একসময় ফাদার হ্যারিস বললেন, তুই ইলেকশানে নামবি?

অবিনাশ মাথা নাড়ল, না না, আমি না—

তবে? ফাদার হ্যারিস সোজা তার চোখের ভেতর তাকালেন।

অবিনাশ তার চার সঙ্গী—ব্রজেন, রাখাল, নটবর এবং প্রিয়-গোপালকে দেখিয়ে বলল, এরা কন্টেস্ট করবে।

ফাদার হ্যারিস বললেন, এদের জন্যেই তুই আমার কাছে এসেছিস নাকি?

হ্যাঁ—

এদের সম্বন্ধে তোর কী ইন্টারেস্ট?

মানে ওরা আমারই লোক তো।

ফাদার হ্যারিস বললেন, বুঝলাম।

অবিনাশ বলল, ওদের মিউনিসিপ্যালিটিতে যাওয়া মানে আমারই যাওয়া। ব্যবসাপত্তর তো অনেক করলাম; এবার একটু জনসেবা—

গোটা বিষয়টা ফাদার হ্যারিসের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি জানেন ব্রজেনরা নানা ভাবে অবিনাশের কাছে অনুগৃহীত। ওদের বেনামে মিউনিসিপ্যালিটিটা দখল করতে চাইছে অবিনাশ।

ব্রজেনদের ওখানে পাঠিয়ে পুতুলনাচের পুতুলের মত সে পিছনে বসে দড়ি টানবে। কিন্তু না, অবিনাশের মত একটা লোককে কিছুতেই মিউনিসিপ্যালিটিতে আসতে দেওয়া উচিত না। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটা ওর হাতে নষ্ট হয়ে যাবে। ফাদার হ্যারিস বললেন, তুই তাহলে রাজা হতে চাস না; পর্দার আড়ালে কিং-মেকার হয়ে থাকতে চাস?

অবিনাশ উত্তর দিল না; ঘাড় চুলকোতে লাগল।

ফাদার হ্যারিস আবার বললেন, এই ব্যাপারেই আমার সাহায্য চাস নাকি?

হ্যাঁ।

কি রকম সাহায্য?

আপনাকে রাজানগরের সবাই রেসপেক্ট করে ভালবাসে। আপনি বললেই এখানকার প্রত্যেকটা লোক ব্রজেনদের ভোট দেবে।

তার মানে তোদের হয়ে ইলেকশান ক্যামপেন করতে হবে, এই তো—

মানে-মানে—

ফাদার হ্যারিস বললে, ছাখ, আমি পলিটিক্সের লোক না, আমি মাস্টার, মিশনারি, আমাকে এর ভেতর টানাটানি করিস না।

অবিনাশ ব্যগ্র ভাবে বলল, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না ফাদার। অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

উঁহু—উঁহু—প্লীজ, এ ব্যাপারে আমাকে আর অনুরোধ করিস না।

ঠিক আছে ফাদার, আপনি আজকের দিনটা ভাবুন। তারপর যা ভাল বুঝবেন করবেন। আমি কাল আবার আসব। ফাদার হ্যারিসকে প্রণাম করে উঠে পড়ল অবিনাশ।

পরের দিন আবার এল সে; তারপরের দিনও এবং তারও পরের দিন। কিন্তু ফাদার হ্যারিস কিছুতেই ব্রজেনদের জন্য নির্বাচনী প্রচারে

নামতে রাজী হলেন না। অসহিষ্ণু অবিনাশ রূঢ় ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনার অসুবিধেটা কী ?

ফাদার হ্যারিস বললেন, তোকে তো আগেই বলেছি আমি টিচার, রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বহু টিচারই তো রাজনীতি করে।

তা করুক ; আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল অবিনাশ। তারপর বলল, আমি পলিটিক্স করতে বলছি না ; জাস্ট একটু সাহায্য করুন।

পারব না।

সত্যি করে বলুন তো, আসল বাধাটা কোথায় ?

ফাদার হ্যারিসের মুখ কঠিন দেখাল। বললেন, শুনতে চাস ?

বলুন না—

তোর মত লোক বেনামে মিউনিসিপ্যালিটি দখল করুক, এ আমি চাই না।

ও, আচ্ছা—দাঁতে দাঁত চাপল অবিনাশ।

ফাদার হ্যারিস বললেন, আরেকটা কথা, তোর ক্যাণ্ডিডেট যাতে জিততে না পারে, সেটা আমি দেখব। আই মাস্ট রেজিস্ট—

এটা বুঝি পলিটিক্স হল না ?

না। কারণ, আমি নিজেও কণ্টেস্ট করছি না, কোনও ক্যাণ্ডিডেটও দিচ্ছি না। শুধু একটা বাজে লোককে বাধা দিচ্ছি।

ঠিক আছে। অবিনাশ তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

*　　　*　　　*

অবিনাশ সেই যে চলে গেল, তারপর ঘণ্টা চারেকও কাটল না, শ্যামের রিকশায় চেপে শিবানী আর উমা মিশনে এসে হাজির।

ফাদার হ্যারিস ওদের মুখচোখের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে ?

শিবানী বলল, বাড়িতে আর থাকা যাবে না ফাদার। লেলোটা

আজ থেকে আবার পেছনে লেগেছে। এমন সব নোংরা কথা বলছে যে চলে আসতে হল।

ফাদার হ্যারিস বুঝতে পারলেন তাঁকে বিব্রত করার জন্য অবিনাশই আবার লেলোকে শিবানীদের দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তোরা এখানেই থাক।

ফাদার হ্যারিসের সংসারে আরো দুটি মানুষ বাড়ল। শিবানী আর উমা এখানেই থেকে গেল।

এগারো

শিবানীরা যেদিন এসেছিল সেটা শুক্রবার। আজ রবিবার।

ভোরবেলা উঠে টুকটুকিকে সাইকেলে তুলে বেড়াতে যাওয়া, ফিরে এসে স্নান করে লিখতে বসা, দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমনো, বিকেলে কোনদিন রাজানগরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া, কোনদিন বা নিজের ঘরের জানালায় বসে সূর্যাস্ত দেখা এ সব যথারীতি চলছিল।

আজ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ফাদার হ্যারিস। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে সন্ধ্যের সময় বাজারপাড়ায় আসতেই চোখে পড়ল বল্টুদের সেই প্যাণ্ডেলে শেতলাপুজো চলছে। নানা রঙের প্রচুর লাইটের খেলা সেখানে। চারটে মাইক আকাশ ফাটিয়ে বেজে যাচ্ছে। এখন আরতি চলছিল; ড্রেন পাইপ-পরা বল্টুরা সারা শরীর কাঁপিয়ে ধুনুচি হাতে নাচছিল; পাশে সেই নাচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাসা বাজছে। অর্থাৎ, সারা বছর ধরে সার্বজনীন পুজো চালাবার যে প্ল্যান ওরা নিয়েছিল তা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ ফাদার হ্যারিসের মনে পড়ল, বল্টু বলেছিল উদ্বোধনের দিন তাঁকে প্রধান অতিথি করবে। হয়তো ভুলে গেছে। তা একরকম ভালই হয়েছে। বল্টুরা এতই মত্ত যে ফাদার হ্যারিসকে দেখতে পায়নি। তিনি আর ওদিকে গেলেন না। প্যাণ্ডেলটার পাশ কাটিয়ে স্টেশনের দিকে সাইকেল চালাতে লাগলেন।

আরো খানিকক্ষণ এধারে ওধারে ঘুরে শীতের রাত যখন গাঢ় হতে শুরু করেছে সেই সময় মিশনের রাস্তা ধরলেন ফাদার হ্যারিস।

বাজার পাড়ার জমজমাট অংশ ছাড়িয়ে দিশী মদের দোকানটার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কাদের গলা শোনা গেল। 'ফাদারের বাচ্চা চলেছে।'

শ্লা, এমন রগড়ে দেব না।

অন্যমনস্কের মতো সাইকেল চালাচ্ছিলেন ফাদার হ্যারিস, চমকে ঘাড় ফেরাতেই তাঁর চোখে পড়ল মদের দোকানের গা ঘেঁষে যে গলিটা তার মুখে লেলো এবং তার দলটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই লেলোরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আকাশ, কুয়াশা ঝাপসা চাঁদের আলো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে লাগল।

ফাদার হ্যারিস সাইকেল থামিয়ে সীটে বসেই একটা পা রাস্তায় রেখে বললেন, আমাকে কিছু বললি ?

লেলোরা উত্তর দিল না। আগের মতই আকাশ-টাকাশ দেখতে লাগল।

ফাদার হ্যারিস একটুক্ষণ অপেক্ষা করে সাইকেলে উঠে পড়লেন। খানিকটা যাবার পর আবার তাঁর কানে এল—খুব অয়েল হয়েছে, নিগড়ে ছেড়ে দেব।

ফাদার হ্যারিস বুঝতে পারছিলেন, মন্তব্যগুলো তাঁরই উদ্দেশে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলেন। ছত্রিশ সাঁইত্রিশটা বছর এখানে কেটে গেল, এর আগে এভাবে কেউ তাঁকে অসম্মান করেনি। ক্ষুব্ধ অপমানিত ফাদারের মন বিষাদে ভরে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মিশনে ফিরে ফাদার হ্যারিস দেখলেন, হীরেন এসেছে। শিবানী, উমা-টুমাদের সঙ্গে খুব গল্প করছে। ফাদারের মনে পড়ল, আজ রবিবার। আজ আসবে, হীরেন বলেই গিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, কখন এসেছিস ? আধঘণ্টা হল।

আমি বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। তোকে আসতে দেখলাম না তো—

বাজারের ওই রাস্তা দিয়েই স্টেশন থেকে মিশনে আসতে হয়।

ওটা ছাড়া আর কোন পথ নেই। হীরেন বলল, হয়ত খেয়াল কর নি, আমিও তোমাকে দেখিনি। যাইহোক ফাদারকে দেখে শিবানীরা পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে হীরেন বলল, তোমার সেকেণ্ড ইনস্টলমেন্ট এনেছি ফাদার; এই নাও। পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে ফাদারের হাতে দিল সে।

ফাদার হ্যারিস টেবলের উপর টাকাগুলো রেখে বললেন, তোর খবর বল—

না কিচ্ছু নেই, চলে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার তো দেখছি ফ্যামিলি বেড়েই চলেছে।

ফাদার হ্যাবিস বললেন, হ্যাঁ শিবানীরা এল, বলতে বলতে লেলোর মুখ চোখের সামনে ফুটে উঠল তাঁর। বিরক্তি বোধ করলেন তিনি, কিছুটা অস্বস্তিও। অন্যমনস্কের মতো বললেন, জন্তুগুলোর জন্য ওরা নিজেদের বাড়িতে থাকতে পারল না।

হীরেন বলল, হ্যাঁ তুমি আসবার আগে সেই কথাটা বলছিল শিবানীরা। একটু থেমে আবার বলল, এখন থেকে তাহলে ওরা এখানেই থাকছে?

কোথায় আর যাবে বল এ অবস্থায় কি করে বলি, তোরা চলে যা।

তা তো বটেই।

বারো

পরের রবিবারও হীরেন এল, তার পরের রবিবারও এবং তারও পরের রবিবার। ফাদার হ্যারিসের টাকা শোধ হয়ে যাবার পরও নিয়মিত প্রতি রবিবার, এমন কি রবিবার ছাড়া অন্যদিনও সে এখানে আসতে লাগল।

ফাদার হ্যারিস বুঝতে পারছিলেন ইদানীং শিবানীর জন্যই ছেলেটা এখানে আসছে। শিবানী সম্পর্কে তার সহানুভূতি এবং আকর্ষণ ক্রমশ টের পাওয়া যেতে লাগল। ফাদার হ্যারিস লক্ষ্য করেছেন, শিবানীও আজকাল হীরেনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

একদিন সকালে বেড়িয়ে এসে তিনি লিখতে বসেছেন, দুর্গা কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে ফাদার বললেন, কিছু বলবি?

ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে দুর্গা মাথা নাড়াল, অর্থাৎ বলবে।

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, কী?

দুর্গা হাত-পা নেড়ে আভাসে ইঙ্গিতে যা বলল সংক্ষেপে এই রকম—হীরেনের সঙ্গে শিবানীর বিয়ে দিয়ে দিন। ওরা পরস্পরকে পছন্দ করে। এ বিয়ে হলে ওরা সুখী হবে।

ফাদার হ্যারিস পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং আনন্দ। এই বিয়ের ব্যাপারটা আগে তিনি ভেবে দ্যাখেননি। অথচ বিয়েটা হলে ভালই হয়। তাঁর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। আর কতদিন বাঁচবেন তিনি? দশ বছর? বারো বছর? যাদের দায়দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, মৃত্যুর আগেই যদি তাদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারেন তবে নিশ্চিন্ত হওয়া

যায়। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের গলায় তিনি বলে উঠলেন, এই না হলে মা জননী! ঠিক বলেছিস মা; দারুণ পরামর্শ দিয়েছিস। হীরেন এলে বলতে হবে।

দিন তিনেক পর হীরেন এলে ফাদার হ্যারিস বললেন, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

ফাদারকে দেখে কিছু আন্দাজ করে নিল হীবেন। তারপর বলল সীরিয়াস কথা?

তা একটু।

নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি কিন্তু—

নার্ভাস হবার মত কিছু নয়।

তাহলে বলে ফেল।

ফাদার হ্যারিস সোজাসুজি বললেন, আমার ইচ্ছা শিবানীকে তুই বিয়ে কর।

ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে হীরেন বলল, আচ্ছা! কিন্তু ধান্দা তো তোমার ভাল নয়।

ধান্দা যেন তোরই খুব ভাল! সপ্তাহে দু-তিন দিন করে যে আসছিস সে কি আমার জন্যে?

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হীরেন বলল, এ হে; ধরে ফেলেছ তুমি! ক্যাচ-কট-কট?

ইয়েস ক্যাচ-কট-কট। বলে একটু চুপ করলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর গাঢ় গলায় আবার বললেন, ছোটবেলা থেকে শিবানীকে দেখছি, মেয়েটা খুব ভাল রে। বিয়ে করলে তুই সুখী হবি; নিশ্চয়ই হবি।

হীরেন উত্তর দিল না।

ফাদার হ্যারিস বলতে লাগলেন, বুড়ো বয়েসে দায়দায়িত্ব নিয়েছি। তুই আমার দায়টা উদ্ধার কর।

হীরেন বলল, কিন্তু—

কিন্তু কী ?

আমার একটা বোন রয়েছে। তার বিয়ে না দিয়ে নিজে বিয়ে করা বুঝতেই পারছ—

ভাবিস না তোর বোনের জন্য ছ-মাসের মধ্যে পাত্র দেখে দেবো। তার আগে তুই শিবানীকে বিয়ে কর।

হুট করে বললেই বিয়ে হয়ে যায় নাকি! ভাবতে হবে, মা'র সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ঠিক আছে, ও-সব আমার ওপর ছেড়ে দে।

*　　*　　*

পরের দিনই ফাদার হ্যারিস কলকাতায় গিয়ে হীরেনের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে মহিলা খুব খুশি। তিনি জানালেন ফাদার যে মেয়ের সঙ্গে হীরেনের বিয়ে দেবেন তাকেই তিনি বুকে তুলে নেবেন। হীরেনের মায়ের ধারণা ফাদার হ্যারিসের মত শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর ছেলের আর কেউ নেই। তিনি যা-ই করুন না কেন তাতে হীরেনের ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।

তক্ষুনি পঞ্জিকা আনিয়ে বিয়ের দিনটা স্থির করে ফেললেন ফাদার হ্যারিস।

পরের মাসে অর্থাৎ মাঘের শেষাশেষি একটা তারিখে বিয়েটা হবে।

বিয়ের দিন শ্যাম এসে খবর দিল, ছেলেরা নাকি ঝামেলা করবে। এখান থেকে শিবানীকে নিয়ে যেতে দেবে না।

সবটা শুনে ফাদার হ্যারিসের মুখ কঠিন হল। বললেন, তাই নাকি ?

শ্যাম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ফাদার হ্যারিস আবার বললেন, তোর কি মনে হয়, আমরা মরে গেছি ?

লে বাবা—আমি কি তাই বললাম ?

তাহলে এক কাজ কর, ছেলেদের গিয়ে খবর দে, আমি এখনও বেঁচে আছি। ওরা যা পারে তাই যেন করে।

বলামাত্রই চলে গেল না শ্যাম ; দাঁড়িয়ে থাকল।

ফাদার হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু বলবি ?

হ্যাঁ। ওই শ্লা লেলো অবিনাশের সঙ্গে ভিড়েছে। তুমি এক কাজ কর ফাদার, থানায় একটা ডাইরি করে রাখো।

কিচ্ছু দরকার নেই। আমি কী করি তুই একবার ত্যাখ না।

শ্যাম চলে গেল।

বিকেলে ফাদার হ্যারিস স্টেশন থেকে হীরেন আর বরযাত্রীদের নিয়ে মিশনে এলেন। দেখা গেল, শ্যাম রাজানগরের আর সব রিক্‌শাওলাকে জুটিয়ে ফাদারদের পাহারা দিতে দিতে এসেছে। এক ফাঁকে ফাদার হ্যারিস হেসে তাকে বললেন, আমার ওপর বুঝি ভরসা রাখতে পারলি না ?

শ্যাম কিছু বলল না, হাসল শুধু।

বিয়ের পরদিন ফাদার হ্যারিস হীরেন আর শিবানীকে রেলস্টেশনে তুলে দিতে চললেন। আগে আগে সমুন্নত মহিমায় হেঁটে চলেছেন ফাদার হ্যারিস ; তাঁর পিছনে সাইকেল রিক্‌শায় হীরেন আর শিবানী। তুধারে এবং একেবারে পিছনে কালকের মত রাজানগরের রিক্‌শাওলারা তো আছেই ; এ ছাড়া আছে ; এ শহরের অসংখ্য মানুষ।

সেই দেশী মদের দোকানটার কাছে আসতে দেখা গেল, পাশের গলিটার অনেকখানি ভেতরে লেলো এবং তার দলটা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে দারুণ আক্রোশ। এক পলক ওদের দেখলেন ফাদার হ্যারিস। তারপর স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললেন।

শিবানীদের সেই যে তিনি কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিলেন, তারপর যখনই রাস্তায় বেরোন লেলোর সঙ্গে দেখা

হয়ে যায়। ছোকরা যেন তারই জন্য ওত পেতে বসে থাকে। ফাদার হ্যারিস লক্ষ্য করেন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লেলোর চোখ হিংস্রভাবে জ্বলতে থাকে। চোখাচোখি হলেই সে অশ্লীল খিস্তি করে। শিবানীর বিয়ের পর লেলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ফাদার হ্যারিসের মনে হয়, যে কোনদিন ছোকরা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে।

তেরো

দেখতে দেখতে রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন এসে গেল। অবিনাশ তার ক্যাণ্ডিডেটদের জন্য রাজানগর ট্রেডিং কোম্পানির বাড়িতে একটা অফিস খুলেছে। পুরোদমে ওদের নির্বাচনী প্রচার চলছে। প্রার্থীদের নানারকম গুণাবলী বর্ণনা করে অজস্র প্যামপ্লেট এবং হ্যাণ্ডবিল বিলানো হচ্ছে। এরা নাকি সমাজসেবী, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় এদের জীবন নাকি উৎসর্গ করা। এ ছাড়া পোস্টারে গোটা রাজানগর প্রায় মুড়ে দিয়েছে অবিনাশ; প্রার্থীদের জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় নির্বাচনী সভাও করে যাচ্ছে।

এদিকে ফাদার হ্যারিসও চুপচাপ বসে নেই। রাজানগরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি প্রতিটি মানুষকে বোঝাচ্ছেন অবিনাশের প্রার্থীদের যেন ভোট না দেওয়া হয়। অবিনাশের মত একটা লোক স্বনামে বা বেনামে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান দখল করুক, এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

রোজ সকালে এবং বিকেলে তিরিশ থেকে চল্লিশটা বাড়িতে যাচ্ছেন ফাদার হ্যারিস। ঘুরতে ঘুরতে আজ বিকেলে সোজা অবিনাশদের বাড়িতে এসেই হাজির। সামনের দিকে অর্থাৎ রাজা-নগর ট্রেডিং কোম্পানির অফিসে প্রচুর লোকজন নিয়ে বসেছিল অবিনাশ। খুব সম্ভব ইলেকশানের ব্যাপার নিয়ে জোর তর্কবিতর্ক চলছে। ফাদার হ্যারিসকে দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

ফাদার হ্যারিস স্নিগ্ধ হেসে বললেন, কেমন আছিস, অবিনাশ?

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকল অবিনাশ। তারপর বলল, ভাল।

কই, পেন্নাম করলি না তো!

ফাদার হ্যারিসের এমনই ব্যক্তিত্ব, অবিনাশ নিঃশব্দে উঠে এসে প্রণাম করল।

ফাদার হ্যারিস এবার বললেন, যা কাজকর্ম কর। আমি সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

অবিনাশের প্রার্থীদের যেন ভোট না দেয়, সরস্বতীকে এই কথাটা বুঝিয়ে তার হাতের হিঙের কচুরি খেয়ে ভেতরবাড়ি থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন ফাদার হ্যারিস। অবিনাশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, চললাম রে অবিনাশ—

অবিনাশ হঠাৎ পিছন থেকে ডাকল, ফাদার—

ফাদার হ্যারিস দাঁড়িয়ে গেলেন। ততক্ষণে অবিনাশ ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে তাঁর কাছে চলে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবিনাশ বলল, আপনাকে একটা কথা বলব।

নিশ্চয়ই বলবি।

আপনি ফরেনার—বিদেশী মিশনারী। আমাদের এ সব ইলেকসান নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছেন? একটু আগের বিমূঢ়তা অবিনাশের আর নেই; সোজাসুজি ফাদারের চোখের দিকে তাকাল সে।

ফাদার হ্যারিস চমকে উঠলেন, আমি ফরেনার! কী বলছিস তুই! ছত্রিশ বছর এদেশে কাটিয়ে দিলাম, তবু আমি বিদেশী! তুই কি জানিস ইণ্ডিয়ার কনস্টিটিউশানে আছে, অনেককাল এখানে বাস করলে এ দেশের সিটিজেনশিপ পাওয়া যায়?

ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশান আমি পড়িনি; অত বিদ্যে আমার পেটে নেই। আপনাকে বলছি, ইলেকসানের ব্যাপারে নিজেকে জড়াবেন না।

কৌতুকের সুরে ফাদার হ্যারিস বললেন, ক'দিন আগে তুইই কিন্তু আমাকে জড়াতে চেয়েছিলি।

অবিনাশ হকচকিয়ে গেল। ফাদার হ্যারিস হাসতে হাসতে বললেন, চলি রে, আর দেরি করলে দুর্গা রেগে যাবে।

ফাদার হ্যারিস যখন রাস্তায় গিয়ে সাইকেলে উঠলেন, অবিনাশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

ফাদার হ্যারিস বললেন, রাখব।

চোদ্দ

ফাদার হ্যারিস যেদিন অবিনাশদের বাড়ি গিয়েছিলেন তার দিনকয়েক পর রাত্রের দিকে শহরের উত্তর দিক থেকে মিশনে ফিরছেন, আচমকা মাটি ফুঁড়ে লেলোরা বেরিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি সাইকেল থামিয়ে মাটিতে পায়ের ভর রেখে সটান বসে রইলেন। বললেন, কী চাই ?

শীতকাল। এর মধ্যে চারদিক দ্রুত নির্জন হয়ে যাচ্ছে। ওধারে ক'টা দোকানপাট এখনও খোলা ; রাস্তার দিকের বাড়িগুলো থেকে একটু আধটু আলো আসছে।

লেলো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শ্লা তোমাকে। তোমার রমজানি বড্ড বেড়েছে। বলেই সাঁ করে কোমরের কাছ থেকে একটা ছোরা বার করল এবং বাধা দেবার আগেই ফাদার হ্যারিসের পিঠে বসিয়ে দিল।

ফাদার হ্যারিস চিৎকার করে উঠলেন ; পরক্ষণেই লুটিয়ে পড়তে পড়তে টের পেলেন লেলোরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং ওদিকের দোকান-পাট থেকে কারা যেন ছুটতে ছুটতে লেলোদের ধাওয়া করছে। অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্তে তাঁর মনে হল, মানুষের ওপর আর বোধহয় বিশ্বাস রাখা যায় না।

দিন দুই পর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল ফাদার হ্যারিসের। একটু সুস্থ হবার পর তিনি শুনলেন, লেলোরা ধরা পড়েছে,

এখন তারা হাজতে আছে; তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ থেকে মামলা সাজানো হচ্ছে—হত্যাপরাধের মামলা।

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হল ফাদার হ্যারিসকে। এর মধ্যে প্রতিদিন—শিবানী-তুর্গা-হীরেন-পিলে থেকে শুরু করে বল্টু-গৌর-নেত্য-হাবলে, মেয়েপাড়ার বাড়িউলি শোভা, নিবারণ হোড, সবিতা, পারিজাত, সুরপতি, টুকটুকি এমন কি সরস্বতী পর্যন্ত কত যে লোক তাঁকে দেখতে এসেছে তার হিসেব নেই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর মিশনে চলে এলেন ফাদার হ্যারিস। অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। শরীর ভীষণ তুর্বল, বুকে পিঠে এখনও বিরাট ব্যাণ্ডেজ রয়েছে। এই অবস্থাতেই কোর্টে সাক্ষ্য দিতে যেতে হল। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই ফাদারের, তাই জজ তাঁকে বসে বসে জেরাব উত্তর দেবার অনুমতি দিয়েছেন।

পাবলিক প্রসিকিউটর নানা প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ একসময় উল্টোদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, দেখুন তো, এরাই আপনাকে ছুরি মেরেছিল কিনা?

উল্টোদিকের 'ডকে' লেলো এবং আরো চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের এখন চেনাই যায় না। মুখে বড় বড় দাড়ি, চোখ তু'ইঞ্চি গর্তে ঢুকে গেছে, সমস্ত শরীর ভেঙে-চুরে কেমন যেন হয়ে গেছে। ঘাড় নীচু করে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে হঠাৎ কী প্রতিক্রিয়া হয়ে গেল ফাদার হ্যারিসের; মায়াই হল যেন। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, না, এরা নয়—

লেলোরা চমকে ঘাড় তুলল।

পাবলিক প্রসিকিউটর চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাল করে দেখে বলুন।

ফাদার হ্যারিস একই উত্তর দিলেন; লেলোরা তাঁকে ছুরি মারেনি।

ফাদারের এই একটি কথাতেই ক'দিন পর লেলোরা মুক্তি পেয়ে গেল।

পনের

দিনকয়েক পর বিকেলের দিকে ফাদার হ্যারিস তাঁর নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন। শরীর তখনও খুব দুর্বল, ব্যাণ্ডেজ কাটা হয়নি।

আজকাল আর তিনি মিশন থেকে বেরোন না; এমন কি সকালের দিকে বেড়াতেও না। তবে সর্বক্ষণ প্রচুর লোকজন আসছে। তাদের সঙ্গে গল্প-টল্প করে তিনি সময় কাটিয়ে দেন।

সেদিন শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলেন ফাদার হ্যারিস; হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল জানালার বাইরে মিশনের মাঠে অবিনাশ এবং সরস্বতী, আরেক দিকে লেলো দাঁড়িয়ে আছে। ফাদার হ্যারিস ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ব্যস্তভাবে ডাকলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে? আয় আয়—

ওরা এগিয়ে আসতে লাগল। আগেই যারা ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারা ক্রুদ্ধ হিংস্র চোখে লেলোদের দেখতে লাগল। ফাদার হ্যারিস তাদের বললেন, ওদের আসতে দে—

লেলোরা এসেই ফাদারের পায়ের ওপর মুখ রেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল। ভাঙা ভাঙা কান্না-জড়ানো গলায় বলতে লাগল, আমরা আপনাকে মেরেছি, আমরা আপনাকে মেরেছি—

ফাদার হ্যারিসের অনুভূতির ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মত কী যেন খেলে গেল। মনে হতে লাগল, তাঁর চোখও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বললেন, দূর বোকা, তোরা মারিসনি। যারা মেরেছিল তারা আর নেই। তোরা কখনও আমাকে মারতে পারিস!

ছু'হাতে পায়ের ওপর থেকে ওদের তুলতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

সরস্বতীও পায়ের কাছে বসে বসে কাঁদছিল। ধরা ধরা আবছা গলায় সে সমানে বলে যাচ্ছিল, ওদের ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর।

চোখের জলে ছুটো পা-ই ভেসে যাচ্ছে। ফাদার হ্যারিসের মনে হতে লাগল, মানুষের ওপর এখনও বিশ্বাস রাখা যায়।